স্বামী বিবেকানন্দ

প্রদ্যোৎ গুপ্ত

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী
১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
নিউ প্রিণ্টার্স
২০৯-সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

—মাতৃদেবীকে—

* রাণী রাসমণি
* শ্রীমা সারদামণি
* ভগিনী নিবেদিতা
* স্বামী বিবেকানন্দ
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দ

—এক—

—এই বিলে কি করছিস রে ?

—দেখছি জাত যায় কিনা।

বিশ্বনাথ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ভদ্রলোক উকিল। শুধু উকিল নয়, তিন পুরুষের উকিল। হিন্দু মক্কেল, মুসলমান মক্কেল সব রকম মক্কেলই আসে। হিন্দুদের জন্য হুঁকোর গলায় কড়ি বাঁধা। মুসলমানদের হুঁকো ন্যাড়া। হুঁকোর মধ্যেও জাত ঠিক করে চিহ্ন দেওয়া আছে। মুসলনমান মক্কেলেরা মিঠাই আনে, সন্দেশ আনে, বিলেকে দেয়—বিলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফেলে দেয়।

বিশ্বনাথবাবুর হিন্দু মক্কেলদের এ ব্যাপারটা খুব পছন্দের নয়। হিন্দু হয়ে মুসলমানের ছোঁয়া খাওয়া এ কেমন কথা। উকিলবাবুও কিছু বলেন না।

বিলে সব কথা শোনে, বোঝে না কিছু। ভাবে জাত যায়! জাতটা কি করে যায়—কেমন করে যায়—দেখা চাই।

শুনেছে মুসলমানদের হুঁকোয় মুখ দিলে হিন্দুদের জাত যায়। বিলে তাই সব হুঁকো টেনে পরখ করছে।

ছেলের কাণ্ড দেখে বিশ্বনাথবাবু প্রশ্ন করলেন।

বিলে উত্তর দিল।

বিবেকানন্দর ছেলেবেলার ডাক নাম বিলে।

মা ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বর শিবের অর্চনা করে পুত্রলাভ করেন। তাই নাম রেখেছেন বীরেশ্বর। বীরেশ্বর থেকে বিলে। ভাল নাম বিশ্বনাথের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাস-জীবনের দিকে এ পরিবারের ঝোঁক বংশগত। নরেনের পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত। নাম, যশ, অর্থ ভরা সংসার ফেলে মাত্র পাঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন—যেমন করেছিলেন সিদ্ধার্থ, শ্রীচৈতন্য।

বিশ্বনাথ দত্ত বিখ্যাত উকিল। যেমন আয় করেন তেমন ব্যয় করেন। মনটিও বড় কোমল।

আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বহু অনাত্মীয় তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিয়ে যায়। হাত পেতে কেউ কখন বিমুখ হয় না।

নরেন যখন বড় হলেন, বুঝলেন বাবার এই কোমলতার সুযোগ নিয়ে আত্মীয়েরা মজা লুটছে। নিশ্চিন্ত আরামে নেশা ভাং করে আর বিশ্বনাথবাবুর অন্নধ্বংস করে।

নরেন প্রতিবাদ করলেন।

—এসবের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় বাবা। এ অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ছেলের কথা শুনে বিশ্বনাথ-বাবু চুপ করে রইলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—বিলে জীবনটা যে বড় দুঃখের, একথা বুঝবার মত বয়স তোর হয়নি। যখন জানবি তখন যারা নেশাভাং করে তাদেরও দয়ার চোখে দেখতে হয়।

বাবার উদারতা ও মহত্বের কাছে নরেন আত্মসমর্পণ করলেন। বিবেকানন্দের উদারতার গোড়াপত্তন তার পারিবারিক জীবনেই হয়েছিল।

বিশ্বনাথ দত্তের শিক্ষা প্রণালী ছিল অভিনব। আধুনিক মনো-বিজ্ঞানীদের মত। কঠোর বাক্য বা শাসনের তাড়না ছিল না। ধীর শান্ত কণ্ঠে শুধু কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে তিনি ছেলের মনের দরজা খুলে দিতেন। বিচার শক্তিকে সবল ও সক্রিয় করে তুলতেন।

একদিন নরেনের কোন কারণে খুব অভিমান হয়। বাবাকে অভিযোগ করে বলেন,—আপনি আর আমার জন্য কি করেছেন ?

বিশ্বনাথ দত্ত একটু হেসে উত্তর দিলেন,—ঐ যে দেয়ালে টাঙ্গান আয়নাটা আছে ঐ আয়নায় চেয়ে নিজেকে দেখ। তাহলেই বুঝবে কি করেছি।

আর একদিন নরেন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন।

বিশ্বনাথ বাবু ছেলেকে কিছু বললেন না। যে ঘরে নরেন বন্ধুদের নিয়ে গল্প করতেন সে ঘরের দরজায় লিখে রাখলেন—আজ নরেন তার মায়ের কথা শোনেনি। নরেন ভীষণ লজ্জিত হলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এ কথা তাঁর মনে ছিল।

বিশ্বনাথবাবু ছেলেকে বলেছিলেন,—দেখ বিলে, সংসারে কোন ব্যাপারেই আশ্চর্য্য হবি না। এখানে সম্ভব অসম্ভব সব কিছুই হতে পারে না।

নরেন আজীবন কথাগুলি মনে রেখেছিলেন।

ভুবনেশ্বরীর পর পর চার মেয়ে। ছেলে নাই। সবাই বলে শিবের আরাধনা কর। শিবঠাকুরের দয়া হলে ছেলে কোলে আসবে।

ভুবনেশ্বরী শিবপূজায় মন দিলেন। বহুদিন কেটে গেল। ভুবনেশ্বরী এক মনে শিবের আরাধনা করছেন। শেষে একদিন স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং শিবঠাকুর এসে তাঁকে বলছেন, তোর পূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোর ঘরে আমি আসব। ভুবনেশ্বরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন।' —ঠাকুর ভোরের স্বপ্ন যেন সত্যি হয়।

ভুবনেশ্বরীর কোলজোড়া ছেলে হলো। চাঁদের মত ছেলে—চাঁদই বা বলব কেন—চাঁদ নয়। —যিনি চাঁদকে কপালে টিপ করে রেখেছেন সেই মহাদেবের মত নয়ন ভুলান রূপ।

বড় দুরন্ত ছেলে। যেমন রাগ তেমন জেদ। সামলান বড় কষ্ট। ভুবনেশ্বরী হাঁপিয়ে ওঠেন।

এক একদিন রাগ করে বলেন, শিবঠাকুর নিজে না এসে একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কখন বলতেন,—দেখ তুই যে এত জ্বালাচ্ছিস, শিবঠাকুর সব দেখতে পাচ্ছেন—তোকে আর কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না।

নরেনের কি হতো কে জানে। ও কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ, জেদ রাগ কিছু নাই।

একদিন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। নরেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভুবনেশ্বরী পাগলের মত হয়ে উঠলেন। চারদিকে লোক ছুটল—কিন্তু সন্ধান নাই। কে একজন বলে উঠল—আরে চিলেকোঠার দরজা বন্ধ কেন! সবাই ছুটল চিলেকোঠায়। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। ধাক্কা ধাক্কি ডাকাডাকি—দরজা খোলে না, সাড়া নাই।

মায়ের মনে সু থেকে কুটাই আগে ডাক দেয়।

' ভিড় ঠেলে সামনে এসে ভুবনেশ্বরী বলে উঠলেন—ভাঙ্গো—দরজা ভেঙ্গে ফেল।

আঘাত—লাথি—ধাক্কা—দুমদাম ধুপধাপ—দরজার খিল ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আঘাতকারিরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

নরেন বসে আছে নিশ্চল—নিরব—নিথর। যেন কেষ্টনগরের মাটির গড়া মূর্ত্তি। সামনে রামসীতার মূর্ত্তি। এত গোলমাল এত

হল্লা এত শব্দ, সাতবাড়ির ঘুমন্ত লোক জেগে ওঠে—কিন্তু নরেনের চৈতন্য নাই।

ভুবনেশ্বরী ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিলে বিলে তুই বেঁচে আছিস?

ছেলে নড়ে উঠল। শিব—শিব—মা গায়ে মাথায় মঙ্গল হাত বুলিয়ে দেন।

এক টুকরো রঙ্গীন কাপড় যোগাড় করে মাজায় জড়িয়ে নিয়েছে। কি হয়েছে? না শিবঠাকুর সাজা হয়েছে। বিলে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

—ও কিরে—ও কি সেজেছিস?

—শিব। গম্ভীর উত্তর।

মা ছেলের কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেন।

—বেশ। কিন্তু তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকো না যেন।

ভুবনেশ্বরী জানেন যে স্বয়ং মহাদেব ছেলে হয়ে তাঁর কোলে এসেছেন। এজন্য বিলে যখন খুব বেশী জেদ বা রাগ করত—এক ঘটী ঠাণ্ডা জল শিব শিব বলে মাথায় ঢেলে দিতেন। ছেলেও অমনি ঠাণ্ডা। কোথায় বা জেদ কোথায় বা দুরন্তপনা। হবেই তো আশুতোষ যে!

ধ্যানে বসতে হবে। মুনি ঋষিরা ধ্যান করেন, দেবতারা ধ্যান করেন, ধ্যান করলে ভগবান দেখা দেন। প্রহ্লাদ করেছে, ধ্রুব করেছে।

বিলে ধ্যানে বসল। সঙ্গীরাও চোখ বুজে ধ্যানে বসেছে।

হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ। ছেলেরা চোখ পিট পিট করে তাকায়। ওরে বাবা মস্ত বড় সাপ—পালা পালা। ধ্যান ফেলে ছেলেরা ছুটে পালায়। বিলে? বিলেতো আসতে পারেনি। কি হবে!

খবর পেয়ে বাড়ির সবাই ছুটে এলো।

প্রকাণ্ড সাপ—জাত কেউটে। মস্ত ফণা তুলে বিলের মাথার উপরে নিশ্চল হয়ে আছে। চেরা জিভটা বারে বারে বাইরে আসছে আবার মুখের ভিতরে চলে যাচ্ছে—চোখ দুটো যেন আগুনের টুকরো।

ভয়ে অস্থির। সাপটাকে মারবার উপায় নাই। কি জানি যদি বিলেকে ছোবল দেয়। শিব! শিব!—ঠাকুর ছেলেকে বাঁচাও। ভুবনেশ্বরীর মনে কান্না গুমরে ওঠে। চোখের উপরে কি এ দৃশ্য দেখা যায়?

সাপটা পলকহীন চোখে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে দেখল তারপর ধীরে ধীরে ফণা গুটিয়ে চলে গেল।

ভুবনেশ্বরী ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঠাকুর বলতেন—নরেন জন্ম থেকেই ধ্যান-সিদ্ধ। ধ্যানে বসলেই কপাল থেকে দুই ভুরুর মাঝখান দিয়ে জ্যোতির বিকাশ হতো। নরেন ভাবতেন সবারই বুঝি ওরকম হয়। তাই কিছু বলতেন না।

একবার ধ্যান শেষে নরেন চোখ খুলেই দেখতে পান এক দিব্য কান্তি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ হয় কিছু বলতে চাইছেন।

নরেন ভয় পেয়ে ঘর থেকে ছুটে যেতেন। পিতামহ দুর্গাচরণের মত। লোকে বলত সিমলার দত্তবাড়ি শুধু উকিলের বাড়ি নয়—সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া।

নরেন বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছে।

নারায়ণ হরি! এক সন্ন্যাসী এসে সেখানে দাঁড়াল। বলল, তোমার ধুতি আমাকে দাও।

নরেন তখনি নতুন কাপড় খুলে সন্ন্যাসীকে দান করে দিলেন।

সন্ন্যাসী সেই কাপড়খানা মাথায় পাগড়ি করে জড়াতে জড়াতে চলে গেল।

দুরন্ত দামাল ছেলে পড়ে গিয়ে একদিন কপাল কেটে ফেলল। একটি কাটা দাগ চিরকালের সাথী হয়ে রইল।

ঠাকুর বলতেন,—ভাগ্যি ওখানটা ওর কেটেছিল না হলে নরেন পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করে দিত। একবার মদন ভস্ম করেছে আর কাকে ভস্ম করত ঠিক কি! ঠাকুর বলতেন নরেন শিবের অংশ নয়—স্বয়ং শিব।

কথকতা হচ্ছে।

কথক ঠাকুর রামায়ণ পাঠ করছেন। হনুমানের কদলীবনের বর্ণনা দিচ্ছেন।

নরেন একমনে শুনছেন।

কথক ঠাকুর বললেন,—হনুমান কদলীবনে থাকেন।

তবে আর কি। নরেন উৎসাহে নড়ে বসলেন। তা হলে সেখানে গেলে হনুমানকে দেখা যাবে?

কথক ঠাকুর এই ক্ষুদে শ্রোতার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন,—হ্যাগো—গেলে পাবে বইকি।

বাড়ির পাশেই কলাবাগান।

নরেন সেখানে যেয়ে চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। হনুমানের জন্য ধ্যান। কিন্তু হনুমান কই। কথক ঠাকুর বলছেন—কলাবাগানে থাকে। তা হলে আসছে না কেন? নরেন ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরলেন।

শুনে গুরুজনেরা বললেন,—বা রে আজ আসবে কি প্রভুর কাছে অন্য জায়গায় গেছে যে! রামচন্দ্র অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন। কাজ না সেরে আসবে কি করে।

সঙ্গত কথা। নরেনের মনে ধরল। রামচন্দ্রের কাজ না করে কি ভক্ত হনুমান আসতে পারে?

বাড়িতেই পাঠশালা বসেছে।

নরেনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হলো।

গুরুমশাই পাঠ দিলে শুনেই নরেনের মুখস্থ হয়ে যায়।

গুরুমশাই বলেন শ্রুতিধর। গোটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটি শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেললেন।

সন্ন্যাসী হবার সখ ছোটবেলা থেকেই। বন্ধুদের বলতেন, দেখবি আমি বড় হলে ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে যাব। দাদুর মত আমিও সংসার ত্যাগ করব। কোন নতুন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলেই নরেন জানতে চাইতেন তাদের বংশে কেউ সন্ন্যাসী হয়েছে কিনা।

পাঠশালায় পড়া শেষ করে নরেন মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্ত্তি হলেন।

তখন আর কতটুকু বয়স—সাত কি আট।

সব শিখতে রাজি—কিন্তু ইংরাজি নয়।

বলেন,—ওতো বিদেশী ভাষা। শিখব কেন?

অনেক করে বুঝিয়ে রাজি করান হলো। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে দেখল নরেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজি শিখে ফেললেন। মোটামুটি যে জ্ঞানটুকু নরেনের হলো উচুক্লাশের ছেলেদেরও সে রকম জ্ঞান ছিল না।

একদিন ঠিক হলো চিড়িয়াখানা দেখতে যেতে হবে। নবাব ওয়াজিদ আলির চিড়িয়াখানা সেই মেটেবুরুজে।

চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকায় করে যেতে হয়।

সঙ্গি সাথীদের সঙ্গে নরেন নৌকায় উঠে বসল।

বেশ ভালয় ভালয় চিড়িয়াখানা দেখে সবাই আবার নৌকায় ফিরে এলো।

নৌকো ফিরে চলল চাঁদপাল ঘাটের দিকে।

মনের আনন্দে ফিরে আসছে সবাই। কিছুটা পথ আসবার পরে একটি ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সামলাতে না পেরে নৌকার উপরেই বমি করে ফেলল।

নৌকোর মাঝিরা চটে লাল! কি রকম ছেলে? এখন এসব কে পরিষ্কার করবে? ছেলেদের কোন কথা শুনতে চায় না।

মাঝিরা মুসলমান, বলল,—ও সব কথা হবে না, পরিষ্কার করে দিয়ে তবে বাড়ি যাবে। কে যাবে তোমাদের বমি পরিষ্কার করতে।

ছেলেরা ডবল ভাড়া দিতে চাইল। কিন্তু মাঝিদের এক কথা—তা হবে না—ভাড়া বেশী দাও নেব—কিন্তু পরিষ্কার করে দিতে হবে।

দলের মধ্যে নরেন সব চেয়ে ছোট। তাই সেদিকে মাঝিরা নজর রাখেনি।

নরেন চুপ করে বসে আছে!

নৌকা ঘাটের কাছে আসতে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে চলে গেল।

মাঝিরা ভাবল, যাকগে ও তো বাচ্ছা ছেলে—তবে এদের ছাড়া হবে না। দূর থেকে নরেন দেখেছেন ঘাটের উপরে দু'জন গোরা সৈন্য দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে।—ঠাকুর বুঝে নৈবেদ্য দিতে হয়।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে সব কথা বুঝিয়ে নরেন সৈন্য দুটির হাত ধরে টানতে লাগল।

সৈন্য দুটিও খুব মজা পেল।

হাসতে হাসতে বলল, চল।

পুলিশ নয় একেবারে কোম্পানীর দু'জন খাস গোরাকে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে মাঝিরা একদম চুপ।

সৈন্যদের কাছে ধমক খেয়ে ছেলেদের ছেড়ে দিল।

নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামীজি তখন হাসতে হাসতে বলতেন,—জানিস ছেলেবেলায় ডানপিটে ছিলাম বলে এক কানা কড়ি পকেটে না নিয়ে দুনিয়া ঘুরে এলাম।

সারা বছর নরেন খেলাধুলায় মত্ত থাকেন। শুধু পরীক্ষার আগে তিন চার মাস বই নিয়ে বসেন। এ তিন চার মাস যা করেন সারা বছর পড়েও অন্য ছাত্ররা তার কাছে যেতে পারে না। ছেলেবেলা থেকেই সত্যের প্রতি ন্যায়ের প্রতি স্থির লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন হলে পিতামাতার অবাধ্য হতে নরেন দ্বিধা করতেন না।

এ শিক্ষা তাঁর পিতৃদত্ত। বিশ্বনাথবাবু বলতেন,—যা সত্য বলে

জানবে—তা কখন ছাড়বে না। এজন্য যদি পিতামাতার অবাধ্য হতে হয় তাও হবে।

বিশ্বনাথ দত্তের অন্তর ছিল কোমল, হৃদয় ছিল উদার। বংশ বা জাতির মর্য্যাদা থেকেও মানুষের মর্যাদা ছিল তাঁর কাছে বড়। পিতা মাতার উপরে নরেনের ভক্তি ছিল অসীম।

বলতেন, – যে বাবা মাকে শ্রদ্ধা না করে, সে মানুষ নয়।

ভুবনেশ্বরী বলতেন, সত্য ও পবিত্র থাকবে। নিজের মর্য্যাদার সঙ্গে অন্যের মর্য্যাদাও রাখবে। দরকার হলে কাদার মত নরম হবে আবার প্রয়োজনে কঠোর হবে। ভুবনেশ্বরী ছিলেন যেমন তেজস্বিনী তেমনি নির্ভিক।

ধ্যানে বসলেই নরেন তন্ময় হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন,—ধ্যান সিদ্ধ। এ ভাব সকলের হয় না।

বিশ্বনাথবাবু সপরিবারে বাইরে যাচ্ছেন।

রেলগাড়ি থেকে নেমে গরুর গাড়িতে অনেকটা পথ যেতে হবে।

বিশ্বনাথ বাবু গাড়ি ভাড়া করলেন।

চারিদিকে অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা! নরেন যেন ডুবে গেলেন। জ্ঞান নাই—ধ্যান গম্ভীর—বসে আছেন যেন যোগী ঋষি।

রায়পুরে সেবার দু'বছর ছিলেন।

রায়পুর থেকে ফিরে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হলেন।

নিজের সমবয়সি বন্ধু-বান্ধদের মধ্যে তিনি ছিলেন সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়—কি খেলা ধূলা, কি পড়াশুনা, কি গানবাজনা।

গানে দক্ষতা ছিল অসামান্য। মনটি যেমন সরল দেহটিও তেমনি সরল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে নরেন্দ্রনাথ এক বছর ছিলেন। এক বছর পরেই জেনারেল এ্যাসেমব্লিস ইনষ্টিটিউশনে চলে যান। লেখা-পড়ায় এ সময় খুব মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে একজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথের ইংরাজি বক্তৃতা শুনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মুগ্ধ হয়ে যান।

যথাসময়ে নরেন্দ্রনাথ গ্র্যাজুয়েট হয়ে ওকালতি পড়া সুরু করলেন। ওকালতি তাঁদের বংশগত পেশা। কিন্তু এ সময়েই বিশ্বনাথ হঠাৎ মারা যান। নরেন্দ্রনাথ অর্থ কষ্টে পড়ে পড়া ছেড়ে দিলেন।

বিশ্বনাথ যেমন আয় করতেন তেমন ব্যয় করতেন বলে কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি।

নরেনের কলেজ জীবনে অন্য কোন ছাত্র কোন বিষয়েই তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ছাত্রসমাজে তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। স্কুলের ডানপিটে ছেলে কলেজে এসে ভিন্ন পথ দিলেন। একাগ্রভাবে পড়াশুনায় মন দিলেন। প্রায় সব সময়ই বই নিয়ে কাটাতেন। দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ছিল প্রিয় বিষয়। তাঁর অসামান্য স্মৃতি শক্তির বিকাশও এ সময় হতে থাকে।

স্মৃতির পাশাপাশি ছিল অসাধারণ মেধা। একবার পড়লে আর ভুলতেন না। কাব্য ও দর্শন পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথের মনে সত্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। সত্যকে জানবার জন্যই দর্শনের মধ্যে আরও ডুবে গেলেন।

বি, এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। কঠোর ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করছেন। মাঝে মাঝে পড়ার ঘরে গানের আসর বসে। এ সবের মধ্যেও অর্ধেক রাত কেটে যায় ধ্যানে সত্যানুসন্ধানে।

সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই আলাপ করেন। উদ্দেশ্য সত্যকে জানা।

রেভারেণ্ড হেষ্টিংসাহেব বলেছেন, আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু এমন একটি ছাত্র আমি দেখিনি। এমন কি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও না। এ ছেলেটি জগতে নাম রেখে যাবে।

দুই

হারবার্ট পেনসার নরেনের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে আলোচনার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে নরেনের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

সত্যকে জানবার আগ্রহ যত প্রবল হয় ততই যেন সে জিনিষটি আরো দূরে সরে যায়। শৈশবের বিশ্বাসটিও নরেন ছাড়তে রাজি নয়। এই বিরুদ্ধ সংঘাতে নরেনের অবস্থা তখন অসহনীয়।

নরেনের মতিগতি লক্ষ্য করে গুরুজনেরা বিয়ের উদ্যোগ করতে লাগলেন।—যতবারই কথা হয় ততবারই কোন না কোন বাধা এসে ভেঙ্গে দেয়। শেষ পর্য্যন্ত বাবার মৃত্যুতে সব আয়োজনের শেষ এলো।

নরেনের কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁর একাগ্র মনের চিন্তা ঈশ্বর আছেন কি নাই—একথা জানতে হবে।

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। ব্রাহ্মদের অনেক কথা বেশ ভালো মনে হলো। জাতিভেদের হীননীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম-সমাজের বিদ্রোহ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার এ দুটি নরেন্দ্রনাথের ভাল লাগল।

ব্রাহ্মসমাজে তিনি নাম লেখালেন। কিন্তু এ মোহও কয়েকদিন পরেই ভেঙ্গে যায়। মনে হলো নতুনের মোহে প্রাচীনকে ত্যাগ করার সার্থকতা নাই।

প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজ ভাল লাগত। ভাবতেন এখানেই বুঝি সত্যলাভের সন্ধান পাবেন।

কিন্তু কই! সে সত্যের সন্ধান এখানে নাই।

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আপনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখেছেন?

মহর্ষি উত্তর দিলেন—তোমার চোখ দুটি যেন যোগীপুরুষের।

হতাশ হয়ে নরেন চলে এলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

নরেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—কি ভাবে সত্যকে জানব? কে বলে দেবে ঈশ্বর আছেন কি নাই?

অবশেষে ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে নরেন এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেলেন যিনি তার সব সন্দেহের নিরসন করলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সিমলার দত্ত বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে এলেন।

নরেনের ডাক পড়ল গান শোনাতে হবে।

ঠাকুর তাকে দেখেই আকৃষ্ট হলেন। যাবার সময় বারবার করে দক্ষিণেশ্বর যেতে বলে গেলেন।

আর একদিন আত্মীয় রাম দত্ত বললেন—ধর্ম ধর্ম করে পাগলের মত বেড়াচ্ছিস কেন, দক্ষিণেশ্বরে যা। সেখানে পরমহংসদেব আছেন তাঁর কাছে তুই যা। তোর সব প্রশ্নের উত্তর সেখানে পাবি। তিনি তোকে ঠিক পথ বলে দিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে দুই বন্ধুকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

ঠাকুরের সে কি আনন্দ।

বললেন—এসেছিস? গান শোনা।

নরেন্দ্র গান ধরলেন—মন চল নিজ নিকেতন।

ঠাকুর মুগ্ধ। গান শেষ হলে হাত ধরে বললেন—হ্যাঁরে এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তো তোর পথ চেয়ে বসে আছি। বিষয়ি লোকদের সঙ্গে কথা বলে মুখে জ্বালা ধরে গেছে।

ঠাকুর হঠাৎ কেঁদে উঠলেন।

হাত জোড় করে বললেন—প্রভু আমি জানি তুমি কে? তুমি সেই পুরাতন ঋষি—তুমিই নরনারায়ণ।

নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন—উন্মাদ ! চুপ করে রইলেন উত্তর দিলেন না।

একটু পরে ঠাকুর তাকে মাখন মিশ্রি সন্দেশ খাওয়াতে সুরু করলেন। বললেন—বল, আর একদিন একলা আমার কাছে আসবি ?

নরেন্দ্রনাথ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কথা দিয়ে গেলেন।

বাড়ি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবতে লাগলেন। যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কয়েকদিনের মধ্যে নানাকারণে যেয়ে উঠতে পারলেন না।

একমাস পরে নরেন্দ্রনাথ একদিন একা এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর একটা ছোট চৌকিতে বসেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখে খুশি হয়ে হাত ধরে পাশে বসালেন। ভাবে বিভোর হয়ে কত কি বলতে লাগলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন পাগলের খেয়াল।

রামকৃষ্ণ হঠাৎ ডান পা দিয়ে নরেনকে ছুঁয়ে দিতেই যেন কি হয়ে গেল! নরেনের মনে হলো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে--ঘুরতে ঘুরতে উঠে যাচ্ছে কোন অসীমে কে জানে। সব অস্তিত্ব বুঝি এখনই শেষ হয়ে যাবে।

ভয়ে বিস্ময়ে কেঁদে উঠলেন—তুমি এ কি করলে, আমার যে বাপ মা বেঁচে আছেন।

ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তবে এখন থাক। সময়ে হবে।

নরেন ভেবেছিলেন ঠাকুর সম্মোহন বিদ্যা জানেন কিন্তু নিজের মানসিক দৃঢ়তার উপরে অগাধ বিশ্বাস। দুর্বল লোকেরাই সম্মোহিত হয়।

এক সপ্তাহ পরে নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

বাগানের মধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ। নরেন লক্ষ্য করে দেখলেন। জ্ঞান হতেই ঠাকুর উঠে এসে নরেনকে ছুঁলেন।

নরেন্দ্রনাথ এবার খুব সতর্ক ছিলেন। তবুও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান হলে দেখলেন ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

নরেন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত আরম্ভ করলেন। তখনও ঠাকুরকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি। কিছুটা পাগল বলে ধরে রেখেছেন।

একদিন তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন ?

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—হ্যাঁগো যেমন তোমাকে দেখছি, তেমনি দেখেছি। দরকার হলে তোমাকেও দেখাতে পারি।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে প্রথমে বিবেকানন্দ ঠাকুরের এসব কথা বিশ্বাস করতে চান নি। ভাবলেন পাগলের প্রলাপ। এ রকম ভাববার কারণও আছে। যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন যুক্তিই খাটে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি, বিশ্বাস, তন্ময়তা তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগল।

সে আকর্ষণ ক্রমে এত প্রবল আকার ধারণ করে যে একদিন এমন সময় এলো যে যখন তিনি রামকৃষ্ণের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিলেন। যুক্তি তর্ক দিয়ে যাচাই করতে চাইলেন না।

বি. এ. পাশ করে নরেন বি. এল. পড়তে আরম্ভ করেছেন। প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা উকিল ছিলেন। নরেনও জীবিকার জন্য এ পথই বেছে নিলেন। কত আশা, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু সাংসারিক জীবনের এ আশা আর পূরণ হলো না। হঠাৎ পিতৃদেবের পরলোক গমন, সকল আশার মূলেই যেন কুঠারাঘাত করল।

বিশ্বনাথ দত্ত কিছু রেখে যেতে পারেন নি। রাখবার মধ্যে কিছু ঋণ রেখে গেছেন।

সংসার অচল হয়ে পড়ল।

সাংসারিক চাপে বিভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ। আত্মান্বেষণ ঈশ্বর চিন্তা

মন থেকে পলাতক প্রায়—চাকরি চাকরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নরেন। অন্ন চিন্তা বড় চিন্তা। সেই অন্ন চিন্তায় নরেন ব্যস্ত। দারিদ্রের কষাঘাত, অন্ন চিন্তা, বেকার জীবন মানুষে জীবনে অভি-শাপের মত। অনেকেই এসময় লোভের ফাঁদে পা দিয়ে বসে থাকে। আসাধারণ মনের জোর না থাকলে তখন লোভ জয় করা অসাধ্য।

নরেন্দ্রনাথের মনে সে জোর ছিল। নৈরাশ্যকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। কয়কজন বন্ধু এ সময় শনিগ্রহের মত উদয় হয়। তাদের চেষ্টা নরেনকে নিজেদের পথে টেনে আনা।

একদিন এক বাগান বাড়িতে তারা নরেনকে নিয়ে যায়। সুন্দরী নারী ও সুরার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

নরেনের মনে কোন দুর্ব্বলতা নাই। তিনি সেইবার বার বনিতাকে এমন সব প্রশ্ন করলেন যে সেই চপলা রমণী লজ্জা ও দুঃখে মাথা নিচু করে বসে রইল। সাহস করে নরেনের মুখের দিকে তাকাতে পারল না।

এ অভিজ্ঞতা তার কাছে নতুন। যাদের সে সঙ্গ দেয়– তাদের মুখে সে এমন দরদভরা প্রশ্ন কখন শোনেনি! ধীরে ধীরে উঠে সে অন্যত্র চলে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে বসেই ঠাকুর সব শুনলেন

ঠাকুর বললেন আমি জানি জীবনে ওর নারী সঙ্গ হবে না।

বহু চেষ্টা করেও একটি কাজ জুটাতে পারলেন না। অভাবের তাড়না বেড়েই চলে। তার উপরে এক পারিবারিক মামলায় ছিল সেটুকুও গেল।

কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নরেন ঠাকুরের কাছে গেলেন—বলুন এখন আমি কি করব? কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না। আপনি আমার হয়ে মা কালীকে একটু বলুন।

ঠাকুর বললেন,—বেশত তুই নিজে যা। মন্দিরে গিয়ে নিজে মাকে প্রার্থনা জানা।

নরেন মন্দিরে গেলেন।

কিন্তু চাইলেন—বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি। বরাভয়দাত্রী, চৈতন্যময়ী ভবতারিনীর কাছে সাংসারিক সুখের প্রার্থনা জানাতে ভুলে গেলেন।

বাইরে আসতে ঠাকুর বললেন,—কিরে মাকে বলেছিস ?

না ভুলে গেছি। নরেন উত্তর দিল।

—তবে আবার যা। ঠাকুর নরেনকে আবার মন্দিরে পাঠালেন। এবারেও তাই।

সাংসারিক সুখভোগের কথা মনেও এলো না—আবার চাইল জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য।

বারবার তিনবার ঠাকুর নরেনকে পাঠালেন। তিনবারই একফল।

ঠাকুর বললেন—যা, মায়ের ইচ্ছে তোর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। সাংসারিক সুখভোগ তোর জন্য নয়।

পিতার মৃত্যুর পরে বছর চারেক নরেন সংসারে ছিল। তারপর যেদিন বুঝল যে সে না থাকলেও সংসার অচল হবে না, সেদিনই সংসার থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মাকে একদিনের জন্যও ভোলেননি। মাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী জ্ঞান করতেন। বলতেন, যে মাকে ভক্তি না করে সে পাপী। কোন কাজের উপযুক্ত সে নয়।

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করেছেন এবার একদিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবেন। ঠাকুর নরেনের মনের ভাব বুঝে অধীর হয়ে উঠলেন।

ডেকে কাছে বসিয়ে বললেন— জানি তুই মায়ের কাজের জন্য এসেছিস। সংসার তোর জন্য নয়। কিন্তু যতদিন আমি আছি আমার কাছে থাক।

ঠাকুর বলতেন,—নরেন ! নরেন আমার 'জাতপুরুষ'। এত ভক্ত আছে কিন্তু ওর মত কেউ নয়। কেশবের যদি একটা শক্তি

থাকে ওর আছে আঠারটা।

শ্রীমা বলতেন, নরেন আমার খাপ খোলা তরোয়াল।

নরেন্দ্রনাথ প্রথমে রামকৃষ্ণকে আধ-পাগল ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও রামকৃষ্ণের অসামান্য চরিত্র, অসামান্য ঈশ্বর প্রেমকে বরাবর শ্রেষ্ঠ ভেবে সম্মান করে এসেছেন।

ঠাকুর বুঝেছিলেন, একে দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরায় প্রসার হবে। তাই তিনি যত্ন নিয়ে নরেনের মন থেকে সব সংস্কার দ্বিধা দূর করে দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, বই পড়ে ধর্মজ্ঞান হয় না। এ হচ্ছে অনুভূতির বিষয়। রামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎ বেদ বেদান্ত। তাঁর শরণ নিলেই সব পাওয়া যাবে।

কাশীপুরে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। নরেন থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। মনে অশান্তি। ধুনি জ্বালিয়ে পঞ্চবটিতে সাধনা চলছে। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য ভাব।

রোজ দক্ষিণেশ্বর থেকে নরেন একবার করে কাশীপুরে যেতেন। মনের সংশয়ও কেটে আসছে। দৈবশক্তি কাকে বলে তার কিছু কিছু আস্বাদও পাচ্ছেন।

ঠাকুরের রোগশয্যায়, নরেন অক্লান্ত সেবা করছেন। সঙ্গে অন্য গুরুভাইরা থাকেন। এ সময়ে ঠাকুর ভক্তদের দিয়ে ভিক্ষা করাতেন। কিছুদিন পরে যুবক ভক্তদের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে গেরুয়া দিলেন।

একবার শিবানন্দ ও অভেদানন্দকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধ গয়া দেখতে যান। ভগবান বুদ্ধের সাধন-পিঠ দেখতে গিয়ে অন্ধকার হয়ে এলো।

নরেন ধ্যানে বসলেন।

অভেদানন্দকে ভগবান বুদ্ধ মনে করে জড়িয়ে ধরেন।

নরেন কাশীপুরে বার বার ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধি-

লাভের বাসনা জানাতেন। ঠাকুর বলতেন, দাঁড়া, আগে আমি ভাল হয়ে উঠি তারপর তুই যা চাস আমি তাই তোকে দেব।

নরেন বলতেন কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন তবে আমার কি হবে ?

নরেনের কথায় ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। বলতেন, শালা বলে কি ?

—আচ্ছা তুই কি চাস ঠিক করে বল।

—ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই।

—ছিঃ ছিঃ ঠাকুর ধমকে উঠলেন, তোর মুখে এ কথা ! তুই হবি বটগাছ, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় নেবে। আর তুই স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

একদিন সত্যিই নরেনের নির্বিকল্প সমাধি হলো। ধ্যান করতে করতে চিৎকার করে উঠলেন --আমার শরীর কোথায় গেল ?

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। ঠাকুর শুনে বললেন, বেশ হয়েছে, থাক শালা কিছুক্ষণ ওভাবে। এর জন্য আমাকে বড় জ্বালাতন করেছে।

ঠাকুর দেহ রাখলেন।

কদিন আগে থেকে নরেনকে ডেকে দরজা বন্ধ করে হু'তিন ঘণ্টা কথা বলতেন। দেহ রাখবার তিন চারদিন আগে ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসতেই নরেনের মনে হলো বিদ্যুতের মত একটি তেজশিখা ঠাকুরের দেহ হতে বেরিয়ে ওর দেহে প্রবেশ করল।

নরেন জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর বললেন আজ তোকে সব দিয়ে আমি ফতুর হলাম।

ঠাকুর আর একদিন বললেন, দেখ নরেন, তোর হাতে এদের দিয়ে যাচ্ছি। এদের ব্যবস্থা করবি।

নরেন বললেন, ওসব আমি পারব না।

পারবি না মানে ! ঠাকুর বললেন—তোর ঘাড় পারবে। এখনও তোর জ্ঞান হলো না, যে রাম সেই কৃষ্ণ—এ শরীরে রামকৃষ্ণ।

দু'দিন পরে ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুরের দেহ ত্যাগের পরেও ভক্তরা কয়েক দিন কাশীপুরে ছিলেন। একদিন একজন গুরু ভাইকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে নরেন ঠাকুরের দেখা পেলেন। ভাবলেন বোধ হয় চোখের ভুল। গুরুভাইকে এ বিষয়ে কিছু বললেন না। কিন্তু গুরুভাই বলে উঠলেন নরেন দেখ—দেখ—

কাশীপুর থেকে সবাই বরাহনগরে চলে এলেন।

বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে দু'একজন করে সন্ন্যাসী থাকতেন, আবার তীর্থ ভ্রমণে চলে যেতেন।

নরেন ছিলেন এই ভ্রাম্যমান দলের একজন। কিন্তু তা হলেও মঠ পরিচালনা তিনিই করতেন। সব ব্যবস্থা তাঁর কথা অনুসারেই চলত।

কিছুদিন পরে মঠ বরাহনগর থেকে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। তারপরে মঠ বেলুড়ে আসে।

মঠ জীবন স্রুরু হতেই যুবক ভক্তদের মানসিক পরিবর্ত্তন হতে থাকে। পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ওঠে।

বরাহনগর মঠে অবিরাম সংকীর্তন চলত। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই সকলেই ঈশ্বর চিন্তায় আকুল।

বিবেকানন্দ নিজে বলেছেন—বরাহনগরে এমন কতদিন গেছে যে, খাবার কিছু নাই জপ আর ধ্যানের সাগরে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। তখন যে রকম কঠোরতা পালন করেছি,—মানুষতো দূরের কথা ভূতও পালিয়ে যেত।

নিজেদের হাতে আমরা সব কাজ করতাম। তার মধ্যেই চলত আমাদের ধর্মালোচনা, দর্শন আলোচনা।

এ সময় আমাদের চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে হতো, কাজে

আমরা পাগল হয়ে যেতাম।

প্রথম দিকে গুরুভাইরা প্রচারের বিরোধী ছিলেন। বলতেন, প্রচার করে কি হবে ?

স্বামীজী বুঝিয়ে, গুরুভাইদের মতের পরিবর্ত্তন করেন।

তিনি বলতেন প্রচার অর্থ প্রকাশ। যদি প্রচার না করি তবে প্রকাশ হবে কি করে ?

স্বামীজি নিজে কঠোর পরিশ্রম করলেও গুরুভাইদের পরিশ্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। গুরুভাইদের শারীরিক ক্ষতির চিন্তায় কাতর হয়ে পড়তেন।

বলতেন ওরে তোরা কি সবাই রামকৃষ্ণ হবি ? এত করতে যাস না। রামকৃষ্ণ পৃথিবীতে একবারই জন্মায়। তোদের এত কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে না।

শুধু সাধন ভজনই নয়। কাজের দিকেও বিবেকানন্দের সে রকম নজর।

ধর্ম, সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য নিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে তর্কের আসর বসাতেন। তিনি একদিকে, আর অন্য সকলে আর একদিকে থাকতেন, তাঁর যুক্তির কাছে গুরুভাইরা নীরব হয়ে যেতেন। তখন আবার নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে নিজের পূর্ব্বমত বিচারে খণ্ডন করে দিতেন।

মাঝে মাঝে বলতেন—এমন দিন আসছে, যখন তোরা বুঝবি হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য ঠাকুর কি করে গেছেন।

সন্ন্যাসীরা শুধু পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। সেবাব্রতও এ সময় তাঁরা আরম্ভ করেন।

সন্ন্যাসীরা কিছুদিন মঠে থাকেন আবার তীর্থে বেরিয়ে যান। আবার ফিরে আসেন আবার যান।

বিবেকানন্দের মনেও এরকম একটা ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি না থাকলে মঠ অচল হবে তাই মনের কথা কাউকেই বলেন নি।

ইচ্ছা যখন অদম্য হয়ে উঠত, তখন তিনি বেরিয়ে পড়তেন। কাছেই কোথাও যেতেন, দু একদিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসতেন।

প্রত্যেক বারই বলে যেতেন—এই যে যাচ্ছি আর ফিরছি না।

১৮৯১ সালে তিনি একা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ তাঁর খোঁজ পায় না। ধরা পড়বার ভয়ে নাম পালটে ঘুরে বেড়াতেন। হয়ত বা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে পড়লো অমনি আবার উধাও।

প্রব্রজ্যা কালে তিনি নিজের জ্ঞান ঢেকে রেখে সাধারণ সাধুর মত ঘুরে বেড়াতেন। একবার প্রতিজ্ঞা করলেন,— ভিক্ষা চাইব না, জুটলে তবে খাব।

পাঁচদিন পর্য্যন্ত না খেয়ে ছিলেন, তবুও ভিক্ষা করেন নি। অনেক দিন ভাঙ্গা দেউলে রাত কাটিয়েছেন, জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় রাত কাটিয়েছেন---কিন্তু কারো আশ্রয় নেননি।

সম্বলের মধ্যে একখানি গেরুয়া আর একটি গীতা। হাতে কমণ্ডুল। কাশী থেকে সারনাথ গেলেন।

একপাল বাঁদর কাশীতে স্বামীজিকে তাড়া করে। স্বামীজি ভয়ে দৌড়াতে থাকেন। বাঁদরও পিছনে তাড়া করে চলে।

পিছন থেকে কে একজন গম্ভীর গলায় বলে উঠল,— থাম্ থাম্ বাঁদরের সামনে ঘুরে দাঁড়া।

স্বামীজি বুদ্ধি ফিরে পেলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়া করতেই পালিয়ে গেল।

একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এসে কাছে দাঁড়ালেন।

স্বামীজি তাঁকে নমস্কার জানালেন। সন্ন্যাসীও প্রতি নমস্কার করে চলে গেলেন।

কাশীতে স্বামীজি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সাক্ষাৎ পান। ভাস্করানন্দ স্বামীকেও দেখেছেন।

কাশী থেকে অযোধ্যা হয়ে আগ্রা গেলেন। আগ্রা থেকে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে পৌঁছলেন স্বামীজি একেবারে শূন্য হাতেই।

রাস্তার পরিশ্রম, পেটে খিদে—স্বামীজি কাতর হয়ে পড়েছেন।

একজন লোক রাস্তার ধারে বসে তামাক খাচ্ছে। স্বামীজি সে দিকে এগিয়ে গেলেন। তামাকে দু'একটা টান দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলে হয়ত শরীরের গ্লানি একটু কমতে পারে।

লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল—সাধু বাবা আমিতো মেথর। আপনাকে কি করে আমি দেব!

স্বামীজিও প্রথম ভাবলেন,—তাইত! কি করে দেবে।

এ ভাবনা শুধু মূহুর্ত্তের। ছি ছি এখনো মনে সংস্কার! এখনো মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে পারি না!

স্বামীজি আবার ফিরে এলেন।

বললেন—দাও ভাই দাও। আমি সন্ন্যাসী আমার জাত নাই। তোমাকে যে ভগবান বানিয়েছেন, আমাকেও তিনি বানিয়েছেন। তুমি আমার ভাই।

স্বামীজি লোকটির হাত থেকে তামাক নিয়ে পরিতৃপ্তিতে টানতে লাগলেন। লোকটি বিস্ময়ে সম্ভ্রমে হাত জোড় করে বসে রইল।

রাস্তা দিয়ে স্বামীজি চলেছেন।—কি বৃষ্টি, যেন সারা বৎসরের বৃষ্টি একদিনেই শেষ হবে। ভিজে গেছেন—ভিজেই চলেছেন। সন্ন্যাসীরা আর শীত গ্রীষ্ম কি! রোদ বৃষ্টি কি!

মনের প্রতিজ্ঞা ভিক্ষা চাইবেন না। দেহ অবসন্ন – কিন্তু মন সতেজ।

স্বামীজি চলেছেন।—

কে যেন পিছন থেকে ডাকল।

স্বামীজি শুনতে পেলেন।

ডাকুক!—আমি ডাক শুনব না, ভিক্ষা চাইব না—প্রয়োজন জানাব না।

লোকটি ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসতে লাগল।

স্বামীজি ছুটতে লাগলেন।

লোকটিও নাছোড়বান্দা—স্বামীজি যত ছোটেন লোকটি তত ছোটে। হাতে নানারকম ফলমূল-মিষ্টান্ন। সাধুবাবাকে খাওয়াতেই হবে। সাধুবাবা যদি দৌড়োতে দৌড়োতে মথুরা পর্য্যন্ত যান, পিছে পিছে যাব।

আর একদিন রাধাকুণ্ডে স্বামীজি স্নান করছেন। কৌপিন খুলে ধুয়ে জলে নেমে পড়েছেন। কৌপিন শুখোলে উঠে কৌপিন খানা পরবেন।

কাছেই কোথাও বোধহয় একপাল বাঁদর ছিল।

লাফিয়ে এসে কৌপিনটি তুলে নিয়ে গাছের উপরে উঠে গেল।

অনেক চেষ্টার পরে যখন কৌপিন খানা ফিরে পেলেন, তখন কৌপিনটা প্রায় অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছে।

স্বামীজির অভিমান হলো। রাধারাণীর উপরে অভিমান। —আর লোকালয়ে ফিরব না। দেখি জঙ্গলের মধ্যে ভক্তের জন্য ভগবান কি ব্যবস্থা করেন। পাশের জঙ্গলের রাস্তা ধরতেই কে যেন পিছন থেকে ডাকল।

স্বামীজি কান না দিয়ে জঙ্গলের দিকে হেঁটে চলেছেন।

লোকটি দৌড়াতে লাগল। স্বামীজিও দৌড়াতে লাগলেন।

বহু কষ্টে স্বামীজির নাগাল পেয়ে লোকটি স্বামীজিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।

ভক্তিভরে স্বামীজিকে ভোজন করিয়ে নতুন কৌপিন দিয়ে প্রণাম করল।

স্বামীজি এবার বৃন্দাবন থেকে হাতরাস এলেন।

শরৎগুপ্ত হাতরাসের ষ্টেশন মাষ্টার।

প্ল্যাটফর্মে স্বামীজি বসে আছেন আসন পিড়ি হয়ে।

শরৎবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

কে উনি! এমন অনিন্দ্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।

শরৎবাবুর মনে হলো এঁর নিশ্চয় আহার হয়নি। অনুমতি

নিয়ে খাবার এনে দিলেন। কাজ শেষে এসে আলাপ করলেন।

আলাপ আর কি করবেন। প্রতি কথাই নতুন—প্রতি কথাতেই মুগ্ধ হন শরৎবাবু।

শরৎবাবু দীক্ষা চাইলেন।

স্বামীজি বললেন,—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, একথা মনে রাখবে, তাহলেই তোমার উন্নতি হবে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

শরৎবাবু শুনতে চান না। মনের দরজায় ডাক এসেছে।—সে ডাকে সাড়া দিতে তিনি সর্ব্বস্ব হারাতেও রাজী।

মাথা নেড়ে বললেন,—আমি শিষ্য হব—আপনার সঙ্গে থেকে সেবা করব।

—সত্যি তুমি যেতে চাও ?

শরৎবা'বু বললেন,—হাঁ।

বেশ ! স্বামীজি ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন,—তবে নাও কুলিদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে এসো।

শরৎবাবু মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করে গুরু প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে গেলেন।

রইল পড়ে ষ্টেশন রইল পড়ে অর্থ উপার্জ্জন, রইল পড়ে সাংসারিক জীবন। গুরুকে অনুসরণ করে হৃষিকেশ এলেন।

সাধারণ সাধুর মত দিন কাটে। শরৎবাবু প্রাণপণে গুরু সেবা করেন। শরৎবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

স্বামীজি আবার হাতরাসে ফিরলেন। এবার স্বামীজি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিঠি গেল বরাহনগরের মঠে কোন গোপন ভক্ত পাঠিয়ে থাকবে।

বরাহনগর থেকে গুরুভাইদের আকুল অনুরোধ নিয়ে চিঠি এলো। স্বামীজী শরৎবাবুকে ও সদানন্দ স্বামীকে নিয়ে বরাহনগরে ফিরে এলেন।

ক'মাস চুপচাপ কেটে গেল।

তারপর আবার একদিন স্বামীজি পথে বেরিয়ে পড়লেন।

গাজীপুর।

পওহারী বাবা থাকেন—শুধু বাতাস খেয়ে আছেন। যোগী পুরুষ - দর্শন পাওয়া কষ্টকর। স্বামীজি গাজীপুর এলেন।

স্বামীজি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

তিনি বললেন,— কি গভীর এই হিন্দুধর্ম্ম। বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলো না। রস্ সাহেব হোলি উৎসব সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। স্বামীজি সাহেবকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

রস্ সাহেব ছাড়া আরো দু'জন ইংরাজ মিঃ পেনিংটন ও কর্ণেল রিভেট স্বামীজির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন।

স্বামীজি পওহারী বাবার দর্শনের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে দেখা না পেয়ে বরাহনগর ফিরে এলেন।

বৈদ্যনাথ ধাম থেকে স্বামীজি এলাহাবাদ এলেন। খবর এসেছে স্বামী যোগানন্দ অসুস্থ। নিরঞ্জনানন্দ ও সদানন্দ আগে থেকেই ছিলেন। সকলের মিলিত চেষ্টায় যোগানন্দ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এখানে একদিন একজন মুসলমান ফকিরকে দেখে সবাই খুব অবাক হলো। ফকির সাহেবের চেহারা অবিকল রামকৃষ্ণের মত।

স্বামীজি এলাহাবাদ থেকে কাশী হয়ে আবার গাজীপুরে আসেন। পওহারী বাবাকে দর্শন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

কয়েকদিন চেষ্টার পরে একদিন সাক্ষাৎ হলো। তাও চাক্ষুস নয়।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ হলো।

পওহারী বাবা বললেন,—যন সাধন তন সিদ্ধি।

স্বামীজি প্রশ্ন করলেন,—তিতিক্ষা ক্যায়েসে মিলে!

উত্তর এলো,— গুরুকা ঘরাম নাওকা মাফিক পড়া রহো।

স্বামীজি আনন্দিত হলেন।

পওহারী বাবা যোগী পুরুষ তার উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত।

রামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে স্বামীজিকে বললেন,--ইনি ভগবানের অবতার।

বিবেকানন্দ স্থির করেন পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন। পওহারী বাবাও রাজী। কিন্তু আশ্চর্য্য স্বামীজি গুহার দিকে গেলেই কে যেন পিছন থেকে টেনে ধরে।

রাত্রির অন্ধকার। স্বামীজি একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। নানা কথা মনের মধ্যে যাওয়া আসা করছে

হঠাৎ চারদিক আলো করে রামকৃষ্ণ দর্শন দিলেন। ছল-ছল চোখে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে আছেন।

আত্মগ্লানিতে স্বামীজির কান্না এলো। কি অবিশ্বাস মন! রামকৃষ্ণদেবকে ত্যাগ করবার কথা মনে এসেছে।

স্বামীজি চেঁচিয়ে উঠলেন,—না না এ হতে পারে না—এখানে অন্য কেউ আসতে পারে না। জয় রামকৃষ্ণ।

গাজীপুর থেকে স্বামীজি কাশী চলে এলেন। খবর পেয়েছেন অভেদানন্দ হৃষিকেশে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! তাঁকে কাশী নিয়ে আসা হলো। স্বামীজিও কাশী এলেন।

বলরাম বাবুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে স্বামীজি কেঁদে ফেললেন।

স্বামীজিকে কাঁদতে দেখে প্রমদাবাবু বললেন,—আপনি কাঁদছেন, সন্নাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা উচিত নয়।

স্বামীজি বললেন,--সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়েছি? আমিও মানুষ।

এর মধ্যে একবার কলকাতা ঘুরে এলেন। তারপর স্বামীজি আবার বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সাত বৎসর আর তিনি ফেরেন নি।

হিমালয় দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এবার বেরিয়েছেন।

প্রথমে এলেন ভাগলপুর। ভাগলপুর থেকে বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথে তখন রাজনারায়ণ বসু ছিলেন। স্বামীজি সেখানেই উঠলেন। বৈদ্যনাথ থেকে কাশী হয়ে অযোধ্যা গেলেন।

এবার সুরু হলো হিমালয় যাত্রা।

প্রথমে নৈনিতাল। নৈনিতাল থেকে বদরিকা আশ্রম।

বদরিকা আশ্রমের নির্জ্জনতায় তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। এক নতুন বিশ্বাস তাঁর মনে জন্ম নিল। প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর বিরাজ করেন!

আলমোড়ার রাস্তায় একদিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজি রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ।

তাঁকে জলের খোঁজ করতে দেখে এক মুসলমান ফকির স্বামীজিকে শশা খেতে দিলেন।

শশা খেয়ে স্বামীজি একটু সুস্থ হলেন।

সারদানন্দ ওকৃপানন্দের সঙ্গেও এখানে স্বামীজির সাক্ষাৎ হয়। এঁরাও হিমলয় ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

আলমোড়ায় থাকতেই তিনি এক বোনের মৃত্যু সংবাদ পান। আঘাত পেলেন। কিন্তু সে আঘাতকে সন্ন্যাসীর কঠোরতা দিয়ে দমন করলেন।

বাড়ীর লোক তাঁর খোঁজ পেয়েছে দেখে তিনি আলমোড়া ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আবার যাত্রা সুরু হলো।

কর্ণপ্রয়াগ চলেছেন। পথে ভীষণ জ্বরে পড়লেন। চটিতে আশ্রয় নিলেন। সুস্থ হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ যাত্রা করলেন।

শ্রীনগরে এসে অলকানন্দার তীরে নির্জন কুটিরে কিছুদিন কাটিয়ে স্বামীজি টিহিরির পথে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু অখণ্ডানন্দের অসুস্থতার জন্য ফিরতে হলো। তারপর অখণ্ডানন্দকে তাঁর বন্ধুর বাড়ি এলাহাবাদে রেখে আবার হৃষিকেশ চলে গেলেন। হৃষিকেশে স্বামীজি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুস্থ হয়ে কিছু দিন বিশ্রাম করলেন।

যখন তিনি মিরাটে ফিরে এলেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্য এত ভেঙ্গে পড়েছিল যে মনে হতো যেন পূর্ব্বের ছায়া।

মীরাটে স্বামীজি তিন মাস বিশ্রাম করলেন। এখানে শুধু লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে তাতেই ডুবে থাকতেন।

স্বামীজি অতি দ্রুত পড়তে পারতেন। পড়া বলতে শুধু রিডিং দেওয়া নয় সেগুলো পরিপাক করে মনে রাখা। এত দ্রুত পঠন সম্বন্ধে স্বামীজির কাছে কেউ যেতে পারেনি।

স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড করে প্রতিদিন তিনি যে শেষ করে ফেলতেন।

লাইব্রেরিয়ান ভাবলেন যে, এ শুধু পড়ার ভান। কোন মানুষের পক্ষে এভাবে পড়া সম্ভব নয়।

একদিন দু'একটি প্রশ্ন করেই ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য মেধা শক্তি। এতদিন পড়েও তাঁরা যা আয়ত্ব করতে পারেন নি, স্বামীজি অতি দ্রুত সে সব আয়ত্ব করেছেন।

মীরাট ত্যাগ করে হরিদ্বার ও হৃষিকেশের পথে পথে কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন গুরুভাইদের ডেকে বললেন, আমি নির্জনে তপস্যা করব। তোমরা চলে যাও।

এই হরিদ্বারও ও হৃষীকেশে ঘুরবার সময় তিনি অনেক মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পান। স্বামীজির অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হলে তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করেন।

তিন

রাজপুতনায় আলোয়ার রাজ্য। স্থানীয় ডাক্তারদের সাহায্যে তিনি বাসস্থান পেলেন।

তাঁর দর্শন কামনায় প্রচুর জনসমাগম হতো। ক্রমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। স্বামীজির গৌরকান্তি, দিব্য দর্শন, জ্যোতির্ম্ময় চেহারা ও ধর্ম্ম আলোচনায় আলোয়ার রাজ্যে আলোড়ন জাগল! ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাঁর ভক্ত। প্রত্যেকেই ভাবে স্বামীজির কৃপা তার উপরেই বেশী।

আলোয়ার মহারাজের দেওয়ানের কানেও এই অভিনব সাধুর কথা উঠল।—তিনি স্বামীজিকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। আলাপ করে এত মুগ্ধ হলেন যে মহারাজকে সাধুজির কথা বললেন। মহারাজের কৌতূহল হলো।

মহারাজের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হলো।

মহারাজ বললেন, আচ্ছা মহারাজ, সবাই যে মূর্ত্তি পূজা করে তাতে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। বলুন তো আমি কি করি?

স্বামীজি বললেন, কি আর করবেন যার যেমন বিশ্বাস। তারপর দেওয়াল থেকে মহারাজের ফটো নামিয়ে আনতে বললেন।

বললেন এ ছবি কার?

দেওয়ান বললেন, মহারাজের।

স্বামীজি একটু চুপ করে থেকে দেওয়ানকে বললেন, এই ছবির উপরে থুথু ফেলুন তো।

বলেন কি! উপস্থিত সকলেই ভয় পেল। কারো মুখে কথা নাই। সবাই চুপ করে আছে।

স্বামীজি বললেন, এতো মহারাজের ছবি—একখণ্ড কাগজ মাত্র

এতে এতো সঙ্কোচ কেন? মহারাজের শুধু ছায়া ছবি—কিন্তু আপনাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন মহারাজের গায়ে থুথু ফেলতে বলেছি। যেন এ ছবিতে থুথু দিলে মহারাজের গায়ে পড়বে।

সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তাই বল! স্বামীজি এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলেন, সত্যি কিছু থুথু ফেলতে বলেন নি।

স্বামীজী মহারাজকে বললেন, রাজা সাহেব এই এক টুকরো কাগজে আপনার ছায়া ধরে রাখা আছে। কিন্তু সবাই এটিকে আপনার মতই সম্মান করে। ভক্তরাও সেইরূপ মূর্ত্তিতে ভগবানের বিম্ব প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং মূর্ত্তি পূজা যারা করে তারা কিছুই ভুল করে না। অন্ততঃ আমি তাই ভাবি।

মহারাজ হাত জোড় করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

---স্বামীজি আমি এত দিন অন্ধ ছিলাম, আজ চোখ খুলল।

মুগ্ধ মহারাজ স্বামীজিকে কিছুদিনের জন্য তাঁর আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করলেন।

স্বামীজি মহারাজের অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন।

প্রায় দু'মাস কেটে গেল স্বামীজি আলোয়ারে আছেন। এবার তিনি আলোয়ার ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আলোয়ার থেকে পাণ্ডুপোল এলেন। হনুমানজীর মন্দিরে রাত কাটিয়ে পরের দিন টাহালা গ্রামে পৌছলেন। টাহালায় একদিন থেকে নারায়ণী হয়ে বসওয়া থেকে জয়পুর চলে এলেন।

জয়পুরে যাওয়ার পথে একজন ভক্ত স্বামীজির একটি ছবি তুলে নেয়। পরিব্রাজক বেশে স্বামীজির এ ছবিটিই প্রথম ছবি।

জয়পুরে স্বামীজি দু'সপ্তাহ ছিলেন। এখানে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। তাঁর কাছে স্বামীজি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়তে চাইলেন। কিন্তু এতদিন চেষ্টা করেও তিনি স্বামীজীকে প্রথম ভাষ্যের টীকা বুঝতে পারলেন না।

স্বামীজিকে বললেন, স্বামীজি বোধহয় আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হবে না।

স্বামীজি লজ্জা পেলেন।

স্বামীজি তিনঘণ্টা অনবরত পড়ে পড়ে তিনদিনের পাঠ আয়ত্ব করে ফেললেন। দেখে পণ্ডিতজী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন। জয়পুর ছেড়ে স্বামীজি আজমীর, আজমীর হয়ে আবু পাহাড় গেলেন। এখানে খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় হয়।

মহারাজ প্রশ্ন করেন, আচ্ছা স্বামীজি জীবনধারণ কি?

স্বামীজি বললেন, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবের আত্মপ্রকাশ।

—শিক্ষা কি?

—প্রচলিত সংস্কারকে অন্তরে স্থান দেওয়ার নাম শিক্ষা।

আর একদিন মহারাজ প্রশ্ন করলেন, স্বামীজি সত্য কাকে বলে?

স্বামীজি বললেন, পূর্ণসত্য এক ও অদ্বিতীয়। সাধারণত সত্য বলতে মানুষ যা ভাবে তা আপেক্ষিক। এক সত্য থেকে অন্য সত্যে যেতে যেতে মানুষ চরম সত্যে পৌঁছায়। তখন আপেক্ষিক সত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মহারাজ আর একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, নিয়ম কাকে বলে স্বামীজি?

স্বামীজি বলতেন, মন যে ভাবে কিছু জিনিষের অনুমান করে নেয় তাই নিয়ম।

মহারজ অপুত্রক। মনে দুর্ভাবনা। তাঁর অবর্ত্তমানে খেতরি রাজ্যের কি হবে?

একদিন স্বামীজিকে মহারাজ দুঃখের কথা জানালেন।

বললেন, স্বামীজি আপনি আশীর্ব্বাদ করলে আমার ছেলে হবে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বামীজি মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করলেন। মহারাজ পুত্রলাভ করলেন।

আবার পথ পরিক্রমা আরম্ভ হলো।

আমেদাবাদ হয়ে ওয়ান, ওয়ান থেকে লিমড়ী।

এতদিন ছিলেন রাজ অতিথি। এবার আবার ভিক্ষা পাত্র হাতে তুলে নিলেন। দিনের বেলায় পথ চলেন। রাত্রে যে কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়ে রাত কাটান। লিমড়ীতে স্বামীজি অভাবনীয় বিপদে পড়লেন।

একদল সাধুর হাতে স্বামীজি বন্দী হলেন। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীজির ব্রত ভঙ্গ করান। একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারীর ব্রত ভঙ্গ করাতে পারলে নাকি কি সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

স্বামীজি ভয় পেলেন না। সাধুরা স্বামীজিকে আটকে ফেলেছে। শুধু একটি ছোট ছেলে মাঝে মাঝে স্বামীজির কাছে আসে। ধুনির কাঠ কয়লা দিয়ে খোলামকুচির উপরে খবর লিখে গোপনে ছেলেটির হাত দিয়ে, স্বামীজি লিমড়ীর রাজার কাছে পাঠালেন।

মহারাজ নিজের দেহরক্ষীদের পাঠিয়ে দিয়ে স্বামীজিকে উদ্ধার করলেন।

লিমড়ী থেকে জুনাগড়—জুনাগড় থেকে গীর্ণার পর্ব্বত। স্বামীজি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এখান থেকে ভুজরাজ্য এলেন।

দেওয়ানজি আর মহারাজ দুজনেই স্বামীজিকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে স্বামীজি আবার জুনাগড়ে ফিরে গেলেন।

জুনাগড়ে বিশ্রাম করে প্রভাসের দিকে যাত্রা করলেন।

সোমনাথের মন্দির, সূর্য্যমন্দির দেখে পোর বন্দরে এসে স্বামীজি থামলেন। এখানে প্রায় আট ন' মাস ছিলেন।

পোরবন্দরের মহারাজের অনুরোধে তিনি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এসময় ত্রিগুণাতীত মহারাজ এখানে ছিলেন। তিনি ও আরো কয়েকজন সন্ন্যাসী মরুতীর্থ হিংলাজে যাবেন বলে

মহারাজের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য এসেছেন।

সে কথা শুনে স্বামীজি বললেন—ছিঃ! অর্থ চাইবি কি জন্য? কেউ দেয় নিবি—না দেয় চাইবি না।

পোরবন্দর ত্যাগ করার সময় স্বামীজি ত্রিগুণাতীত মহারাজকে সাবধান করে দিলেন যেন বরাহনগর মঠে তাঁর সংবাদ পাঠান না হয়।

পোরবন্দরে থাকার সময় স্বামীজি একজন পণ্ডিতকে বেদের অনুবাদ করতে সাহায্য করেন।

স্বামীজির পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতেরা বলেন স্বামীজি আপনার স্থান ভারতবর্ষ নয়, আপনি প্রতিচ্যে যান। সেখানে গিয়ে এই জ্ঞানের দীপ শিখা জ্বালিয়ে দিন।

যত বেদ পড়েন স্বামীজির মনে ততই বিশ্বাস হয় যে বেদের আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস এখানে—এই ভারতে। আজ ভারতের সে গৌরব কোথায়? অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। স্বামীজি অন্তরে আঘাত পেলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—বিদেশী শিক্ষায় আত্মবিমুখ জাতির এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমার করার কি শক্তি আছে। আমি কি করব।

স্বামীজির মনে বার বার একথাগুলি ঘোরাফেরা করতে লাগল।

দ্বারকায় এসে আবার তিনি স্বাধীনতা পেলেন। রাজা মহারাজের আতিথ্য তাঁকে আটকায় না। সারদা মঠের এক নির্জন ঘরে বসে ভারতের অতীত গাথায় ডুবে রইলেন। বর্তমান ভারতকে কি করে তিনি ভুলবেন, স্বামীজি শুধু সে চিন্তা করেন।

খাণ্ডোয়ায় এখন অনেক বাঙ্গালী। স্বামীজির সঙ্গে তাঁদের আলাপ হলো। হরিদাস বাবুর অনুরোধে স্বামীজি খাণ্ডোয়ায় বক্তৃতা দিতে রাজি হলেন কিন্তু শ্রোতা না হওয়াতে বক্তৃতা দেওয়া হয় নি।

খাণ্ডোয়ায় থাকার সময়েই শিকাগো ধর্ম্মসভায় যাবার ইচ্ছা স্বামীজির মনে হয়।

স্বামীজি বোম্বাইয়ে এলেন।

এ সময়ে সর্বদাই স্বামীজি চিন্তিত থাকতেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,— তখন তাঁকে দেখলেই মনে হতো যেন তাঁর ভিতরে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

বোম্বাই থেকে স্বামীজি পুনরায় চলেছেন। গাড়িতে বাল গঙ্গাধর তিলক ও আরো কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন।

স্বামীজিকে দেখে তারা ইংরাজিতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনায় তারা সকলেই একমত—এই সাধুরাই ভারতের সর্বনাশ করছে। একমাত্র বাল গঙ্গাধর সে মতের বিরুদ্ধে ছিলেন।

স্বামীজি প্রথমে চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন। তারপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখে তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন।

ভদ্রলোকেরা অপ্রস্তুত হলেন। ইংরাজিতে কথা বলছিলেন, যাতে সন্ন্যাসী তাদের কথা বুঝতে না পারেন।

সন্ন্যাসীর মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজি শুনে তাঁরা যেমন অপ্রস্তুত হলেন, বিস্মিতও হলেন সেইরকম।

স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে সবাই মাথা নিচু করল।

বালগঙ্গাধর স্বামীজিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

পুনা থেকে স্বামীজি বেলগাঁয়ে এলেন। এখানে বহু আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাবে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। ধর্ম ছাড়া, জড় বিজ্ঞান, রামায়ণ, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও উচ্চ-গণিতে স্বামীজির পারদর্শিতা দেখে সকলেই বিস্মিত হতো।

বেলগাঁও ছেড়ে স্বামীজি দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পথে যাত্রা করলেন।

প্রথমেই এলেন বাঙ্গালোর। দেওয়ান কে, সি, আবার

স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন এই সন্ন্যাসী অসাধারণ। স্বামীজিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। মহীশূরের রাজা স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

মহারাজ স্বামীজিকে প্রসাদে নিয়ে এলেন। মহারাজ রোজই ধর্মালোচনা করার জন্য নানা বিষয়ে স্বামীজির পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

স্বামীজির স্পষ্টবাদীতায় মহীশূর রাজ্যের সকলে অবাক! কোন দুর্বলতা তিনি সহ্য করতেন না। কিন্তু অন্যের সঙ্গে অলোচনায় কোন ব্যক্তির গুণ ছাড়া দোষের কথা উল্লেখ করতেন না।

মহীশূরে এক বিরাট পণ্ডিত সভা ছিল।

বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে সে সভায় আলোচনা হতো। স্বামীজিকে কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি বেদের সার কথা এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বললেন যে সকলেই তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার কাছে মাথা নীচু করলেন।

একদিন মহারাজ স্বামীজিকে বললেন,— বলুন, স্বামীজি আমি আপনার জন্য কি কাজ করতে পারি?

বিবেকানন্দ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে বললেন,— ভারতবর্ষের দর্শন ও আধ্যাত্মবিদ্যা আমি পাশ্চাত্যে প্রচার করব।

মহারাজ বিদেশ যাত্রার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে চাইলেন। স্বামীজি রাজি হলেন না। মহারাজ উপহার দিতে চাইলেন. স্বামীজি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু বার বার অনুরোধ করায় তিনি একটি হুঁকো নিলেন।

মহীশূর থেকে প্রথমে কোচিন, কোচিন থেকে ত্রিবাঙ্কুর। তারপর ত্রিবান্দ্রম থেকে রামেশ্বর যাত্রা করলেন। মাদুরায় রামনাদের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামীজি অনুরাগী হয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামনাদ রাজাও স্বামীজির শিকাগো ধর্মসভায় যাবার ব্যয়ভার বহন করতে চাইলেন।

স্বামীজি রামেশ্বর দেখলেন। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্ত—সেখানে ভারতের পবিত্র মাটি সমুদ্রে প্রবেশ করেছে—সেই শেষ বিন্দুটি রামেশ্বর। স্বামীজির বহুদিনের সাধ পূরণ হলো।

স্বামীজি ভারতবর্ষের শেষ পাথরটির উপরে বসে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন।

এখানে বসেই তিনি উপলব্ধি করেন—

খালি পেটে ধর্ম হয় না। নিপীড়িত দরিদ্রের সেবার কথা এখানে বসেই তাঁর মনে হয়। সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে লোককে ধর্মের উপদেশ দেওয়া মানে হলো পাগলামি। ধর্মকে ধারণ করবার মত পুষ্টি ও দেহের প্রয়োজন। স্বামীজির এই প্রব্রজ্যা কালটি ঘটনা বহুল। শুধু সম্মান নয় অনেক স্থানে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সম্মানেও যেমন স্বামীজি উৎফুল্ল হননি লাঞ্ছনাতেও ভেঙ্গে পড়েননি। উভয় অবস্থাতেই নির্বিকার।

তাডিঘাট ষ্টেশনের চৌকিদার স্বামীজিকে প্লাটফর্মের ছায়ায় না বসতে দিয়ে অসহ্য রোদের মধ্যেই বার করে দেয়।

গরম বালির উপরে বসে স্বামীজি ঘামতে লাগলেন। অন্য যাত্রীরা ছায়ায় বসে বসে এ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। কেউ কেউ বা হাসতে লাগল।

একজন লোক হাতজোড় করে বিনিতভাবে বলল,—বাবাজি আপনি এখানে কেন ? চলুন, আমার ওখানে চলুন। কিছু আহার গ্রহণ ও বিশ্রাম করবেন।

লোকটি হালুইকর। স্বামীজিকে সযত্নে লুচি ও মিষ্টান্ন খাইয়ে তামাক সেজে দিল।

স্বামীজি জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কথা তুমি জানলে কি করে ?

স্বপ্নে জেনেছি।

স্বামীজি তখন রাজপুতনা ভ্রমণ করছেন। স্বামীজির কামরায়

দু'জন সাহেব উঠেছে। তারা স্বামীজিকে নিরক্ষর ভেবে নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে হাসি তামাসা করছিল।

কিছুদূর এসে এক ষ্টেশনে গাড়ি থামলে স্বামীজি ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে ইংরাজিতে এক গ্লাস জল চাইলেন।

সাহেব দুটি নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত হল।

বলল,—আপনি ইংরাজি জেনেও এতক্ষণ আমাদের কথার প্রতিবাদ করেননি কেন?

উত্তরে স্বামীজি বললেন,—এর আগেও আমার সঙ্গে বহু মূর্খ লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে।

সাহেবেরা উত্তেজিত হয়ে মারমুখো হয়ে উঠলো।

স্বামীজি আস্তিন গুটিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন,—আও।

স্বামীজির উদ্যত মূর্ত্তির কাছে এগিয়ে যেতে সাহেবেরা সাহস পেল না। আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল।

আর এক সময় স্বামীজি এক থিয়োযফিষ্ট সহযাত্রীর পাল্লায় পড়েন। লোকটি নানারকম প্রশ্ন করে স্বামীজিকে বিরক্ত করে তোলে। স্বামীজিও তার বোকার মত প্রশ্নের উত্তরে কাল্পনিক কথা শুনালেন। লোকটি খুশি হয়ে স্বামীজিকে খাবারের ভাগ দিল। স্বামীজি লোকটিকে বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছেন। অন্ধ বিশ্বাস ভাঙ্গবার জন্য কড়া সুরে বললেন—তোমরা হচ্ছ পণ্ডিতমূর্খ। এদিকে নিজেদের শিক্ষিত বলে চেঁচাও, ওদিকে গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস কর।

ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন। তারপর স্বামীজি তাঁকে নানা বিষয়ে পরিষ্কার করে তার সংশোধন করে দিলেন।

এক ষ্টেশনে স্বামীজির অপেক্ষা করছেন। স্বামীজির নাম শুনে রোজ লোক আসে, দর্শন করে—প্রশ্ন করে—কিন্তু তিনি খেয়েছেন কিনা সে খোঁজ কেউ করে না। তিন দিন এরকম ভাবে কাটল।

তারপর একদিন এক চামার এসে বলল,—মহারাজ আপনি তিন দিন কথা বলছেন কিন্তু এক ফোঁটা জলও খাননি। আজ আপনাকে আহার করতে হবে।

স্বামীজি বললেন—বেশ তাহলে তুমিই কিছু খাবার দাও।

লোকটি বলল—সে কি মহারাজ আমি চামার—আপনি আমার হাতে খাবেন কি? আমি আটা এনে দিই আপনি বানিয়ে নিন।

না, তোমার বানান রুটিই আমি খাব।

ষ্টেশনের লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল,—সে কি বাবা, আপনি চামারের হাতে খাবেন?

উত্তরে স্বামীজি গম্ভীর গলায় বললেন,—আপনারা অনেকে এতদিন আমাকে নানা প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু কেউ আমার আহারের বিষয়ে খোঁজ নেননি। অথচ নিজেরা উঁচু নিচু জাতের বড়াই করেন। কিন্তু এই মুচি নিচু জাত হয়েও যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিল আপনারা কেউ সে পরিচয় দেননি। তাহলে ও নিচু কিসে হলো?

একদিন স্বামীজি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। জ্ঞানলোপ পাবার মত অবস্থা। হঠাৎ তাঁর মনে হলো আত্মার মধ্যেই তো জীবের সব নিহিত আছে—তবে আমি কাতর হচ্ছি কেন? সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি ক্ষমতা ফিরে পেলেন।

এ রকম বহু বাধা বিপদে স্বামীজিকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সব কিছুই তিনি হেলায় পার হয়ে এসেছেন। আশ্চর্য ভাবে উদ্ধার পেয়েছেন। উঁচু নিচু ভেদাভেদ তিনি মেনে চলতেন না। যে আগ্রহ নিয়ে ডাকে তার কাছেই তিনি যান। এজন্যই বোধ হয় প্রতিটি দেশবাসীকে তিনি নারায়ণ বলে ভাবতেন। আর এই মেলামেশায় ভারতের প্রকৃত ছবিটি তিনি দেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিচারহীন ধারণাই এই ধর্মান্ধতার মূল। তাই তিনি

ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে গেছেন—পাপীর হৃদয়েও সাধুতার বীজ লুকিয়ে থাকে।

কন্যাকুমারিকা থেকে পণ্ডিচেরী এলেন। পণ্ডিচেরী থেকে মাদ্রাজ। তাঁর আগমনে মাদ্রাজে আলোড়ন জাগল।

দলে দলে লোক আসে। যুবকেরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। বিদেশ যাত্রার ব্যবস্থাও মাদ্রাজের লোকেরা করে দিল। সে জন্য মাদ্রাজ সমস্ত ভারতের নমস্য। মাদ্রাজবাসীরা যদি সেদিন স্বামীজিকে বিদেশ না পাঠাতেন তবে পৃথিবী আজ স্বামীজির অমৃত ভাষণ থেকে বঞ্চিত থাকত।

স্বামীজি সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, নানা বিষয়ে তাঁর কথা মাদ্রাজ-বাসীদের শোনালেন। তাঁর বাণী মুহূর্তের মধ্যে মাদ্রাজবাসীদের অন্তর জয় করে নিল। একদিকে কালিদাস, শেক্সপিয়র, অন্যদিকে বেদ, বেদান্ত, ইতিহাস নিয়ে আবার কখন বা দ্রৌপদী ও সাবিত্রী সম্বন্ধে তার বক্তৃতায় মাদ্রাজবাসী মুগ্ধ।

একদিন তাঁর সম্মানের জন্য ভোজসভার আয়োজন হলো। বহু লোক উপস্থিত। স্বামীজির বক্তৃতায় সভা নিস্তব্ধ। শুধু মাত্র কয়েকজনের ছোট একটি দল স্বামীজিকে অপ্রতিভ করতে চাইল। কিন্তু স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির খোঁচায় তারা নিজেরাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ করলেন।

আর একদিন কয়েকজন কলেজের ছাত্র স্বামীজির কাছে এলো। উদ্দেশ্যে স্বামীজিকে পরীক্ষা করা।

প্রশ্ন করল—ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

স্বামীজি উত্তর না দিয়ে বললেন,—আগে আমাকে বল শক্তি জিনিসটা কি?

পুস্তকের মুখস্থ বুলি আউড়ে ছাত্ররা উত্তর দিল।

স্বামীজি তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। তারপর

বললেন, সেকি শক্তি কি তা তোমরা জাননা, অথচ রোজ তোমরা এ কথাটা ব্যবহার করছ। আর তোমাদের বুঝাতে হবে ঈশ্বর কি ?

তারপর তিনি ভগবান আর শক্তি সম্বন্ধে তাদের যে সব কথা শোনালেন, সে কথা শুনে ছাত্রেরা মাথা নিচু করে চলে গেল।

মাদ্রাজে বহু ভক্ত হলো। তিন সপ্তাহে তিনি সমস্ত মাদ্রাজের অন্তররাজ্য জয় করে নিলেন।

এখানে তিনি শিষ্যদের জানালেন, তিনি শিকাগো ধর্মসভায় যাবেন। হিন্দুধর্মকে তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বার করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

স্বামীজির মনের ইচ্ছা জেনে মাদ্রাজি ভক্তরা চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে পাঁচশ টাকা উঠল।

হঠাৎ একদিন স্বামীজির মনে হলো--মা কি চান ? তিনি কি চান না যে আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিদেশে যাই।

শিষ্যদের ডেকে বললেন,—দেখ ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে আমি মায়ের ইচ্ছা জানতে চাই। তিনি চাইলে অর্থ আপনি আসবে। এ অর্থ এখন গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

হায়দরাবাদ থেকে স্বামীজির নিমন্ত্রণ এলো। তিনি এ অনুরোধে মায়ের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন এবং হায়দরাবাদ চলে এলেন।

হায়দরাবাদের নবাব সাহেব স্বামীজির বিদেশ যাত্রার জন্য এক হাজার টাকার তোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন।

স্বামীজি হাসি মুখে প্রত্যাখ্যান করলেন।

বললেন এখনো সময় আসেনি। সময় এলে আপনাকে জানাব।

মহবুব কলেজে একদিন বিকালে স্বামীজি তার বিদেশ যাত্রার সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। হায়দরাবাদবাসিরা অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন।

হায়দরাবাদ থেকে আবার মাদ্রাজ চলে এলেন।

আমেরিকা যাবার জন্য আবার অর্থ সংগ্রহ সুরু হলো। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছ থেকে মুখ্যত চাঁদা সংগ্রহ হতে লাগল। কারণ স্বামীজি বলতেন, তিনি আমেরিকা যাচ্ছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য। এজন্য তাঁদের কাছ থেকেই চাঁদা সংগ্রহ করা ভাল।

ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা, এ সুযোগ ছাড়া যায় না। এ সুযোগ সব সময়ে আসে না।

যতদিন যায় স্বামীজি ততই যেন কেমন অস্থিরতা অনুভব করেন। মায়ের আদেশ না এলে যান কি করে। হঠাৎ মনে হলো শ্রীমার কথা। ঠাকুরের অংশ, জগৎ জননী, ঠাকুর পর্য্যন্ত তাঁকে প্রভু বলে পূজো করতেন। মাকে চিঠি লিখলেই তো হয়।

শ্রীমাকে চিঠি দেবার আগেই স্বামীজির সন্দেহ কেটে গেল। স্বপ্নে ঠাকুর দর্শন দিলেন। ঠাকুর সমুদ্র পেরিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন, ইঙ্গিতে স্বামীজিকে অনুসরণ করতে বলছেন। কে যেন কানে কানে বলছেন—যাও।

শ্রীমার আশীর্বাদ চেয়ে স্বামীজি চিঠি লিখলেন। শ্রীমাও চিঠি পাবার আগে এমনি একটি স্বপ্ন দেখেন।

চিঠি পেয়েই শ্রীমা আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীমার চিঠি পেয়ে স্বামীজি আনন্দে আত্মহারা। জগজ্জননীর বরাভয় পাওয়া গেছে এখন আর বীরভদ্রকে ঠেকায় কে! হেলায় সমস্ত পৃথিবী জয় করে ফিরে আসবেন। শ্রীমার আশীর্বাদ সমস্ত বিপদের রক্ষাকবচ।

অনেক ভক্ত জমা হয়েছে– স্বামীজির বাণী শুনতে। স্বামীজি প্রবেশ করেই বললেন,—আমি বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। মায়ের আদেশ পেয়েছি।

ভক্তেরা আনন্দে গুঞ্জন করে উঠলেন।

প্রচুর টাকা চাঁদা উঠল।

যাত্রার দিন স্থির। খেতরির মহারাজের অনুরোধে যাত্রার দিন পিছিয়ে দেওয়া হলো। স্বামীজির আশীর্বাদে পুত্র লাভ করেছেন। উৎসব হবে– সে উৎসবে স্বামীজি না থাকলে সবই বৃথা। মহারাজ সেক্রেটারি জগমোহনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বামীজিকে নিয়ে যেতে।

স্বামীজি বললেন, আমি আমেরিকায় যাচ্ছি এখন যাব কি করে ?

জগমোহন উত্তর দিল আপনি না গেলে মহারাজ খুব আঘাত পাবেন। অন্তত এক দিনের জন্য হলেও আপনি চলুন।

স্বামীজি ঠিক করলেন মাদ্রাজ আর ফিরবেন না। খেতরি থেকে বোম্বাই এসে জাহাজে উঠবেন। স্বামীজি মাদ্রাজ ত্যাগ করলেন।

খেতরিতে স্বামীজি সন্ধ্যায় পৌঁছলেন।

বহু রাজা মহারাজা এই উৎসব উপলক্ষে খেতরি এসেছেন। স্বামীজিকে দেখে খেতরির রাজা সকলের সম্মুখে স্বামীজিকে প্রণাম করলেন।

সকলের সঙ্গে স্বমীজির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সনাতনধর্ম প্রচারের জন্য স্বামীজি আমেরিকা যাচ্ছেন শুনে সকলেই স্বামীজিকে ধন্যবাদ জানালেন।

স্বামীজির আশীর্বাদের জন্য রাজকুমারকে সভায় আনা হলো। স্বামীজি শিশুর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কয়েকদিন খেতরিতে কাটিয়ে স্বামীজি বিদায় নিলেন। মহারাজ জয়পুর পর্যন্ত স্বামীজিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

আবুরোড ষ্টেশনে রাত কাটালেন।

এখানে গাড়িতে উঠলে এক গণ্ডগোল বাধল।

স্বামীজির একজন ভক্ত স্বামীজির সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন

সময় একজন সাহেব এসে স্বামীজির ভক্তকে নেমে যেতে হুকুম করে। ভদ্রলোক সে কথা শুনলেন না। সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল।

স্বামীজি ভক্তটিকে ঝগড়া করতে বারণ করলেন।

সে কথা শুনে সাহেব স্বামীজিকে ধমক দিয়ে উঠল, – তুম কাহে বাত করতা হ্যায় ? স্বামীজি আরক্ত চক্ষু তুলে সে দিকে তাকালেন। তারপর তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে বললেন—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে জান না ? তুম তুম কাকে বলছ ? আপ বলতে পারনা ?

সাহেব বুঝল ভুল জায়গায় চোখ রাঙ্গান হয়েছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অন্যায় হয়েছে আমি ভাল হিন্দী জানিনা। আমি শুধু এই লোকটাকে বলছিলাম—স্বামীজি এবার ফেটে পড়লেন।

—তুমি বললে হিন্দী ভাল জান না। আমি দেখছি তুমি নিজের ভাষাটাও ভাল জান না। তোমার নম্বর বল, তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।

সাহেব বুঝল এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কেটে পড়াই ভাল। স্বামীজি বললেন, শেষবার বলছি নম্বর দাও।

একথা শেষ হবার আগেই সাহেব সরে পড়ল।

বোম্বাইতে নেমে জগমোহন স্বামীজির সঙ্গে বহু অর্থ দিয়ে পি, এ্যাণ্ড, এ, কোম্পানির পেনিনস্যুলার জাহাজের একখানা টিকিট কেটে দিল।

॥ চার ॥

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে জাহাজ ছাড়বে। স্বামীজি জাহাজে উঠলেন। স্বামীজির মন চিন্তাক্লিষ্ট। স্বদেশের মাটি ছেড়ে যাচ্ছেন। মাটির টানে নাড়ি টন টন করে ওঠে। অপরিচিত বিদেশ, অনিশ্চিত কর্মপদ্ধতি, স্বামীজির মনে চিন্তা। মনে পড়ে শ্রীমাকে, মনে পড়ে বরাহনগরের মঠ, মনে পড়ে গুরু ভাইদের সস্নেহ আবরণ —মনে পড়ে দেশ, জাতি, ধর্ম আর মাতৃভূমি।

স্বামীজি সন্ন্যাসীর কঠোরতায় অশ্রুরোধ করলেন।

ঢং ঢং করে জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠল।

যারা বিদায় সম্ভাষণ দিতে এসেছেন তাদের চোখে জল, মুখে হাসি।

জাহাজ নড়ে উঠল—ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে চলল। স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছেন ডেকের উপরে—যতক্ষণ দেখা যায়।

আমেরিকা যাত্রার ঠিক আগে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। এর আগে অনেক নাম গ্রহণ করেছেন আবার পরিত্যাগ করেছেন।

জাহাজের মধ্যে অনেকেই স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এলেন।

জাহাজ কলম্বোয় থামল।

স্বামীজি বুদ্ধদেবের নির্বাণ সময়ের একটি মূর্ত্তি দেখে এলেন।

জাহাজ মালয়ের রাজধানী পেনাং হয়ে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে হংকংয়ে এসে থামল।

হংকং হলো চীন দেশে।

চীন আর ভারতবর্ষ, তখন দুটি দেশই পরাধীন—দুটি দেশই দরিদ্র। সভ্যতার মাপকাঠিতে দুটি দেশই পশ্চাৎপদ।

হংকংয়ে জাহাজ তিন দিন ছিল।

স্বামীজি ক্যাণ্টন দেখে আসেন।

একটি মঠ দেখার ইচ্ছা হলো, কিন্তু বিদেশীরা সেখানে প্রবেশ অধিকার পায় না। স্বামীজির প্রবল ইচ্ছা। তিনি ও কয়েকজন জার্মান ভদ্রলোক একজন দোভাষী নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

কিছুদূর এসেই দোভাষী বলল,—পালান—ঐ দেখুন।

সকলে তাকিয়ে দেখল কয়েকটি লোক লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে। জার্মান সাহেবেরা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। স্বামীজিকে ফেলে ছুটে পালালো। দোভাষীও পালাচ্ছিল।

স্বামীজি তার হাত ধরে ফেললেন।

বললেন,—তোমাদের ভাষায় যোগী শব্দটি আমাকে বলে যাও।

দোভাষী কোন রকমে বলে পালিয়ে গেল।

স্বামীজি দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকগুলো লাঠি নিয়ে কাছে আসতেই স্বামীজি বললেন,—আমি যোগী। হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকগুলো তাড়াতাড়ি স্বামীজিকে প্রণাম করে।

তারপর মঠে নিয়ে গেল।

এর পরে জাহাজ এসে থামল।

জাপানীদের জীবনযাত্রা ও কর্মচাঞ্চল্য স্বামীজির খুব ভাল লাগল। তিনি জাপান থেকে মাদ্রাজে একটি চিঠি লেখেন।

ভূয়া শিক্ষারমোহে ভ্রান্ত দেশবাসীদের সমালোচনা করলেন।

লিখলেন,—এখানে এসে দেখে যাও, নিজেরা শিখে যাও। ভারতমাতা আজ কমপক্ষে হাজার যুবক বলি চান। যানা মানুষ, বাবু নয়। সকলে এগিয়ে এসো প্রস্তুত হও। জাপান থেকে কানাডায় এলেন। কানাডা থেকে ট্রেনে শিকাগো পৌঁছলেন।

শিকাগো নেমে স্বামীজি প্রথমটা খাবার খেলেন। ধর্ম মহাসভার জন্য কতলোক শিকাগোতে এসেছে। কিন্তু কারো পোষাক তাঁর মত নয়। তাঁর পোষাক দেখে কিছু দুষ্ট লোক পিছনে লাগল।

ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নানাভাবে স্বামীজিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাইল। স্বামীজি একটি হোটেলে আশ্রয় নিলেন।

শিকাগোতে স্বামীজি কয়েকদিন ছিলেন। ঘুরে ঘুরে মেলা দেখেন, একা একাই থাকেন। চারপাশে এত লোক তবুও নিঃসঙ্গ।

পয়সা খরচা হচ্ছে জলের মত। চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ধর্ম-মহাসভার এখনও দু'তিন মাস বাকী। যেভাবে খরচ হচ্ছে, এতদিন এ টাকায় চলবে না। তার উপরে ধর্মসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনও শেষ হয়ে গেছে।

একবার ভাবেন ফিরে যাই। পরে স্থির করলেন শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন।

বোষ্টনে থাকার খরচ অনেক কম শুনে স্বামীজি ঠিক করলেন, কয়েকদিন বোষ্টনে থাকবেন।

ট্রেনে বোষ্টন যাবার সময়ে ট্রেনে এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি স্বামীজিকে আদর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

খরচ কিছু বাঁচল বটে কিন্তু জামা কাপড় দরকার। সামনে শীত। তাছাড়া এ পোষাক দেখে সকলেই ঠাট্টা করছে। ব্রিজি মেভার্স থেকে মাদ্রাজে চিঠি লিখলেন। পয়সা অভাবে স্বামীজি চিন্তিত হলেও মনোবল হারান নি। স্থানীয় লোকের সঙ্গে যত পরিচয় হতে লাগল তত স্বামীজির নানাদিক থেকে সুবিধা হচ্ছিল। এখানে জে. এইচ. রাইটের সঙ্গে আলাপ হয়। রাইট সাহেব ছিলেন গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত।

রাইট সাহেব স্বামীজির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। ধর্মসভায় যোগ-দানের কথা বললেন। বিবেকানন্দ অসুবিধার কথাগুলি জানালেন। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম প্রতিনিধিরূপে কোন অভিজ্ঞান নাই।

রাইটসাহেব সে কথা শুনে নিজে সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। স্বামীজির দুর্ভোগ কিন্তু শেষ হলো না। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, স্বামীজি আবার শিকাগোর ট্রেনে উঠলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে পরিচয় পত্রটি পথে হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিকানাটাও মনে নাই। শিকাগোয় নেমে স্বামীজি অকূলে পড়লেন।

বিদেশ বিভূঁই—অপরিচিত লোক—অচেনা ব্যবস্থা—কোন লোকই সাহায্য করতে চাইলেন না।

স্বামীজি নিরুপায় হয়ে স্টেশনের এক কোণে একটি বাক্সের মধ্যে রাত কাটালেন। রাত শেষ হলে হ্রদের উপকূল ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে রাস্তার এক পাশে বসে পড়লেন।

উল্টো দিকে এক বিরাট অট্টালিকা। দরজা খুলে একজন মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—আপনি কি ধর্ম্ম সভার প্রতিনিধি?

—হাঁ।—স্বামীজি বললেন, ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

সেই মহিলা স্বামীজিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।—পরিচর্য্যায় সুস্থ করলেন।

নিজে স্বামীজিকে ধর্ম্ম মহাসভার অফিসে পৌঁছে দিয়ে এলেন। প্রাচ্যের প্রতিনিধির সঙ্গে থাকবাব ব্যবস্থা করে দিলেন।

এ মহিলার নাম মিসেস হেল।

শিকাগো ধর্ম মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার। কত দেশের কত প্রতিনিধি, কত পণ্ডিত, কত মহাপুরুষের সমাগম হয়েছে। কত ধর্ম প্রচারত, কত সংস্কারক ও সাধক।

এই সভার আয়োজনের পিছনে যে অর্থ থাক—ফল খুব ভাল। পশ্চিমের ধর্ম মত আর পূর্বের ধর্ম মতের আদান প্রদানের রাস্তা খুলে যায়। মানুষ তার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে, ধর্মের অন্ধকারের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করবার সুযোগ পায়।

স্বামীজি বিবেকানন্দর অমৃতবাণীও এই ধর্ম মহাসভাকেই কেন্দ্র করে বিশ্ববাসী শুনতে পায়।

১৮৯৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার দশটায় প্রথম ধর্ম মহাসভার অধিবেশন সুরু হলো।

সাই ইনষ্টিটিউট হল অব কলম্বাসে ডাক্তার ব্যারোজ সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সভা উদ্বোধন করেন।

পাঁচ ছয় হাজার মহাপণ্ডিত উপস্থিত। গম্ভীর পরিবেশ। রোমান পোপ কার্ডিনাল গিবন্স এক পাশে গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। তাঁর এক পাশে বসে আছেন স্বামীজি ; তাঁর পাশে বসে আছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার।

বক্তৃতার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে স্বামীজির সংখ্যা হচ্ছে ত্রিশ।

স্বামীজি সভায় গিয়ে যে কল্পনা করেছিলেন, দেখলেন সে সভা তার চেয়েও অনেক বড়।

স্বামীজির সময় আসতেই স্বামীজি এখন নয় বলে সময় নিলেন। কয়েকবার এরকম সময় নিতে শেষবারের মত যখন শুনলেন যে এখন না বললে তাঁকে আর সুযোগ দেওয়া হবে না।

স্বামীজি গুরুদেবের নাম স্মরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। রেশমি গৈরিকে আবৃত সমুন্নত দিব্য কান্তি—উপস্থিত সকলের দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপরে।

স্বামীজি উত্তেজনা অনুভব করছিলেন।

বুঝিবা একটু বিচলিত বোধ করলেন। গুরুর নাম নিয়ে দুর্বলতা দূর করে স্বামীজি প্রস্তুত হলেন।

উদার কণ্ঠের ঝঙ্কারে ধর্মমহাসভার বিরাট পরিবেশ ভরে উঠল। হল নিস্তব্ধ। প্রত্যেকের দৃষ্টি স্বামীজির দিকে আকৃষ্ট হল।

স্বামীজির মুখ নিঃসৃত বাণী মুহূর্তে আমেরিকা জয় করে নিল।

আমার আমেরিকান ভাই ও বোনেরা···

নিস্তব্ধ হল যেন ফেটে পড়ল। হাত তালির দীর্ঘরেশ, শুদ্ধ ভক্তির গলিত দৃষ্টি, স্বামীজি চুপ করে দাঁড়ালেন। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের পালা শেষ হল। সব দ্বিধা, সব সঙ্কোচ দূর করে

বিবেকানন্দ যেন জ্বলন্ত আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লেন।

প্রথম দিনের ভাষণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই তিনি যে কথা শোনালেন সে কথা কেউ বলেন নি।

একথা শুনে আমেরিকাবাসী বুঝল এই প্রাচ্য সন্ন্যাসীর কাছে অনেক কিছু শুনবার আছে, অনেক কিছু শিখবার আছে।

স্বামীজি বললেন সকল ধর্মের লক্ষ্য এক।

এই একটি কথাই কেউ বলেনি। সকলেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে ব্যস্ত। অপরে ভ্রান্ত এই কথাই যেন বলতে চায়।

স্বামীজি বললেন, গুরুদেব রামকৃষ্ণের কথা—তাঁর শিক্ষা—সকল ধর্মের লক্ষ্য এক।

দ্বিতীয় দিন বললেন, আমাদের মতভেদ কেন? কোন আঘাত নাই, কোন কটাক্ষ নাই, শুধুমাত্র সরল যুক্তি, সরলবাক্য, সহজ কথা। হিন্দুধর্মের বহুর মধ্যে একের ব্যাখ্যা করলেন।

জড় উপাসক পাশ্চাত্য জগতের কাছে স্বামীজির বাণীগুলি অভিনব মনে হলো। মনে হলো এমন সুন্দর কথা কেউ বলেনি। ধর্ম মহাসভার শ্রেষ্ঠ আসনটি, জয়ের মুকুটটি প্রাচ্য সন্ন্যাসি কেড়ে নিলেন।

লোকের আগ্রহ, আজ কি বলবেন? দিশেহারা পাশ্চাত্য জগৎ যেন অমৃতের স্বাদ পেল।

স্বামীজি শোনালেন হিন্দুধর্মের কথা। যে কথা জগৎ জানে না। তারা জানে হিন্দুদের কথা মিশনারিদের মুখ থেকে। যারা ভারত-বাসীর আত্মাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসতে চায়।

স্বামীজির ব্যাখ্যায় মনে হলো সূর্যের আলোর নিকট বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করতে যাওয়ার মত ভারতে ধর্মপ্রচার করতে যাওয়া। স্বামীজি বললেন ধর্মই ভারতের প্রকৃত অভাব নয়।

স্বামীজির ভাষণে থাকত মিত্রতার সুর, স্বদেশপ্রীতি, হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

স্বামীজি মহাসভায়—আমাদের মতভেদ কেন, হিন্দুধর্ম, ধর্মই

ভারতের প্রকৃত অভাব নয়, নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত দর্শন, ভারতের আধুনিক ধর্ম, হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্মের ক্রমপরিণতি—এবিষয়ে বক্তৃতাগুলি করেন।

স্বামীজির বক্তৃতা শুনবার জন্য লোকের উৎসাহ দেখে ধর্ম মহাসভার পরিচালকগণ স্বামীজির বক্তৃতা শেষের দিকে রাখতেন। এ যেন সভাসমিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মত লোক ব্যস্ত থাকবে।

নীরস ধর্মতত্ত্ব ও স্বামীজির বাচনভঙ্গী, তীক্ষ্ণ যুক্তি ও আন্তরিকতার জন্য সরস হয়ে উঠত।

শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজি যেন দিগ্বিজয় করলেন। নাম ছড়িয়ে পড়ল। শিকাগো সহর স্বামীজির ছবিতে ভরে গেল। সকলের মুখেই এই প্রাচ্য সন্ন্যাসীর কথা। একটু দর্শন, একটি বাণীর জন্য শিকাগোবাসী পাগল হয়ে উঠল।

স্বামী বলেছেন—আমেরিকানদের কথা আর কি বলব আমার ইউরোপ যাবার খরচ এখান থেকেই উঠবে।

স্বামীজী বিপুলভাবে জনপ্রিয় হন। ইচ্ছা কবলে চরম ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় তিনি নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু স্বামীজি খ্যাতির শীর্ষে উঠেও জন্মভূমিকে মুহূর্তের জন্যও ভোলেন নি। স্বামীজির জনপ্রিয়তা পাদরীদের ভাল লাগেনি। তারা এতদিন যে সব প্রচার করেছে স্বামীজি সবকিছু মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। যে দেশ এত উচ্চ দর্শন—ভক্তদের অধিকারী সে দেশে শিখাতে যাবার কিছু নাই কিন্তু শিখতে যাবার অনেক আছে। পাদরীরা স্বামীজিকে অপদস্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

এই মিশনারি পাদরীরা সুন্দরী নারী পাঠিয়েও প্রলোভনের ফাঁদ পেতেছিল। হিন্দুর সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ঈর্ষাই এর কারণ। মিশনারিরা স্বামীজির বিষয়ে অনেক মিথ্যা রচনা করে। কিন্তু স্বামীজির অম্লান চরিত্রের জীবন্ত শিখায় সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বেশী সময় নেয়নি।

একটি বক্তৃতা কোম্পানীর ব্যবস্থায় তিনি আমেরিকা ঘুরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ধর্ম, দেশ, জাতি, ভারতীয় নারী প্রভৃতি অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের শুনালেন। আমেরিকা-বাসিরা এক নতুন চিন্তাধারার স্বাদ পেল।

বোষ্টন, ব্রুকলিন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক সব জায়গায় স্বামীজি বক্তৃতা দিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি বিরক্তবোধ করতেন। কিন্তু তবুও তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই বক্তৃতার ফাঁকে বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই কোম্পানীর সংশ্রব ত্যাগ করেন। কোন রকম হীন আচরণ স্বামীজি সহ্য করতে পারতেন না। এই কারণেই তিনি কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

মিষ্টার ইঙ্গারসোল ব্যক নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হয়। ঐ ভদ্রলোক নাস্তিক ছিলেন। ধর্ম বা ঈশ্বর মানতেন না।

একদিন তিনি বললেন,—জগৎকে যথাসম্ভব ভোগ করবার পক্ষপাতি আমি। যতটা পারি ভোগ করে নেব। কারণ পৃথিবীর অস্তিত্ব আমরা বুঝি, অন্য অস্তিত্ব আমরা বুঝি না। পৃথিবী নিশ্চিত, অন্য অনিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের পিছনে দৌড়াবার কোন কারণ নাই।

স্বামীজি বললেন, আপনার চেয়ে ভালভাবে ভোগ করতে জানি আমি। এতে আরো বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায়। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, সে জন্য আমার ব্যস্ততা কম। আমি জানি আমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তাই আমি হজম করে খাব। সব কিছুতেই আমি ঈশ্বরের বিকাশ দেখতে পাই, ঈশ্বর ভেবে মানুষকে ভালবাসার কত আনন্দ, কত সুখ।

একবার একগ্রামে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজি বিপদের মুখে

যেয়ে পড়েন। গ্রামের কিছু যুবক, স্বামীজি সর্বদাই সব অবস্থাতেই অচল ও অটল শুনে পরীক্ষা করে দেখে। একটা পিপের উপরে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতীয় দর্শন ব্যাখ্যা করছেন—এমন সময় তার কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটতে লাগল।

স্বামীজি ভ্রুক্ষেপ না করে বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাঁর এই অবিচল সাহস দেখে সকলে মুগ্ধ হলো। বুঝল যে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী সম্বন্ধে তারা যা শুনেছে তাতে কোন ভুল নাই।

একবার এক রেল স্টেশনে একজন নিগ্রো এসে স্বামীজিকে বলে—আপনি আমার স্বজাতী, আপনার নাম শুনে আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে এসেছি। স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করে নিগ্রোটিকে টেনে নিলেন।

এতদিন পাদরী ও গির্জার একঘেয়ে ধর্ম ব্যাখ্যায় আমেরিকা-বাসীদের মনে ক্লান্তির ভাব দেখা দিয়েছিল। স্বামীজির মুখে অন্য রকম আলোচনা শুনে নতুন উদ্যম জেগে উঠল। নতুন ভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হলো।

আমেরিকা বিজয়ের কথা যখন ভারতে পৌঁছাল, তখন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।

ঠাকুর বলেছিলেন,—নরেন একদিন জগৎ মাতাবে। সেই মহাপুরুষের মানসপুত্র বিবেকানন্দ জগৎ মাতিয়ে নিলেন।

ভারতের সর্বত্র, বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে তখন শুধু স্বামীজির কথা। অন্য কোন আলোচনা নাই, সর্বত্র আমেরিকা বিজয়ের আনন্দ।

কলকাতায় টাউন হলে বিরাট সভা। রাজা প্যারিমোহন হলেন সভাপতি। পণ্ডিতজন সমাগমে সভা পূর্ণ

সভা থেকে ঠিক হলো স্বামীজিকে অভিনন্দনবাণী পাঠাতে হবে।

শিকাগোর ধর্মমহাসভা শেষ হলে স্বামীজি পর্যটনে বের হলেন। আমেরিকাবাসীকে ভারতের কথা শোনালেন। ভারতীয় দর্শন

বেদান্ত, ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতার কথা শোনালেন।

আমেরিকাবাসীরা সে সব কথা শুনে একদিকে যেমন মুগ্ধ হলেন, অন্যদিকে তেমনি বিস্মিতও হলেন।

যে দেশের আদর্শ এত মহান্, যে দেশ সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম গুরুর পদে বসতে পারে সে দেশ সম্বন্ধে কত অজ্ঞান ছিল!

স্বামীজিকে ওসময়ে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা করা চলে। শুধু নিজে নয় গুরু ভাইদেরও বহ্নিময় করে তুললেন। ধর্মের কথা, ঈশ্বরে বিশ্বাস সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠত তাঁর স্বদেশ সেবার কথা।

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় এ ছিল স্বামীজির অন্যতম একটি আদর্শ।

তিনি অনেক সময় বলেছেন—লোকে আমাকে কি বলে সে কথায় কাণ দিও না, তারা আমাকে ভাল বলুক, মন্দ বলুক তাতে কি আসে যায়। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাব। এমন কি মৃত্যুর পরেও। মিথ্যার চেয়ে সত্য বড়। চরিত্র বল, পবিত্রতা বল আর মনুষ্যত্বই বল সব কিছুই সত্যকে অবলম্বন করে। সুতরাং সত্যই হলো আসল। আমি যতদিন বাঁচব তোমাদের চিন্তা নাই। আমার ক্ষতির যে-ই করুক, সফল হবে না—ঈশ্বরের কথা—ন্যায়-ই সত্য। শিক্ষাগারের পরিবেশ মঠের মত কঠোর। শিক্ষার্থীদের গুরুকে বাজিয়ে নেবার সুযোগ দিতেন। যোগ, শরীরতত্ব ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিতেন যে, বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরাও তাঁর কথায় গভীর আস্থা প্রকাশ করতেন।

এ সময় বিবেকান্দ রাজযোগ পুস্তকটি রচনা করেন। পতঞ্জলি যোগের সূত্র ব্যাখ্যা মিস ওয়ালডোকে তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন। মিস ওয়ালডো লিখে নিতেন।

নিউইয়র্কের বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনেক শিষ্য তাঁর ছবি ছাড়া তাঁকে জীবনে দেখবার সুযোগও পান নি।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজি ক্লান্ত বোধ করলেন। একজন বন্ধুর অনুরোধে তিনি মেন ক্যাম্প বলে একটি নির্জন স্থানে কিছুদিন কাটিয়ে এলেন। জায়গাটি হচ্ছে সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপ।

এখানে একদিন স্বামীজির নির্বিকল্প সমাধি হলো।

দেড়মাস বিশ্রাম করে নিউইয়র্কে এসে ইংল্যাণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করলেন। এসময় ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ করে পাঠাচ্ছিলেন।

এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি আমেরিকা ত্যাগ করে প্রথমে প্যারিসে আসেন। প্যারিস হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান। স্বামীজি দেখলেন। প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেন।

এই সময় ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে মিশনারীরা স্বামীজির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচার আরম্ভ করে। নানা মিথ্যা অপবাদ রটনা করে দেশবাসীর মন বিষিয়ে তুলতে চায়।

প্যারিসে এসে স্বামীজি এ খবর পেয়ে গুরুভাইদের চিন্তিত হতে নিষেধ করে পত্র প্রেরণ করেন।

বলেন, চিন্তা করো না, যা মিথ্যা তা কখনও সত্য হতে পারে না, তার আয়ুও বেশী নয়।

বিব্রত শিষ্য ও গুরুভাইয়েরা নিশ্চিন্ত হলেন। স্বামীজির দৃঢ়তায় তারাও দৃঢ় হলেন।

লণ্ডনে পৌঁছেই স্বামীজি সম্বর্দ্ধনা পেলেন। তাঁর আমেরিকা বিজয়ের কথা সে দেশও জানত।

স্বামীজি আবার কঠিন পরিশ্রমে মেতে উঠলেন। আরম্ভ হলো আবার বক্তৃতার পালা। বিষয় সেই এক বেদান্ত ও আধ্যাত্মিকতা।

ক'দিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনবাসীদের মন জয় করে নিলেন— ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে এখানেই স্বামীজির পরিচয় হয়।

গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা নিবেদিতা তার The

master as I know him গ্রন্থে লিখেছেন—

নভেম্বর মাসের একটি সন্ধ্যায়-- রবিবার, খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। ওয়েষ্টএণ্ডের একটি বসবার ঘরে আগুনের দিকে পিছন করে তিনি বসে আছেন। সামনে শ্রোতারা অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসে আছে। তিনি যখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল যেন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করছেন। গীত ধ্বনির মত সুমিষ্ট। তাঁর মনে নিশ্চয় এই প্রায় অন্ধকার গোধূলিতে, ভারতের কোন গ্রাম প্রান্তে স্তূপমূলে অথবা উপবিষ্ট কোন সাধুর চারপাশে শ্রোতাদের কৌতুককর রূপান্তর বলে মনে হয়ে থাকবে। ইংল্যাণ্ডে এমন সুন্দরভাবে আমি আর কখনও স্বামীজিকে দেখিনি।

গেরুয়া পোষাক পরে আছেন, আর মাঝে মাঝে শিব শিব ধ্বনি করছেন। মুখে অপূর্ব কোমলতা যেন র‍্যাফেলের আঁকা মিষ্টিল চাইণ্ডের মত। তিনি গীতার 'কারি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগনাইব' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, সুতোয় গাঁথা বহুমনির মতো সমস্তই আমার মধ্যে আছে।

স্বামীজির কথা শুনবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হতো। তিনি কর্ম, পুনর্জন্মবাদ, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। অনেক সময় বসবার জায়গা না থাকায় শ্রোতারা মেঝেতেও বসে থাকতেন।

ইংল্যাণ্ডে আশার অতিরিক্ত ফল পেলেন। স্বামীজি ইংল্যাণ্ডে শুধু বেদান্ত প্রচার করবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে বেদান্ত ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়।

ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজির ধারণা ছিল—

ইংরাজরা ঐতিহ্যবাহী, আমেরিকার মত নতুন কিছু দেখলেই তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে না। অনেক চিন্তা ও যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু একবার গ্রহণ করলে, আমেরিকানদের মত তু'দিনেই তা ভুলে যায় না। গ্রহণ করলে সে জিনিষ সহজে

বর্জ্জন করে না।

স্বামীজি এ জন্য এখানে অধিকতর মন দিলেন।

কিছুদিন প্রচারের পরে স্বামীজি নিবৃত্ত হলেন। যা প্রচার করেছেন তার ক্রিয়া হতে সময় নেবে। এজন্য মঠের ভার কয়েক-জন বিশিষ্ট বন্ধুর হাতে দিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন।

প্রথমবার স্বামীজি ইংল্যাণ্ডে তিন মাস ছিলেন।

স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিস ওয়ালডো আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করছিলেন। স্বামীজি তাঁদের কাছে ফিরে এলেন। এবার কর্মযোগের 'পরে আলোচনা করেন। এ সময়ের বক্তৃতাগুলিই পরে কর্মযোগ নামে প্রকাশিত হয়।

স্বামীজি দু 'সপ্তাহ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেন। গডউইন নামে স্বামীজির এক শিস্য এসময় এই বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করেন।

বিবেকানন্দ গডউইনকে বলতেন মাই ফেথফুল গডউইন।

গডউইন মারা গেলে স্বামীজি আক্ষেপ করে বললেন আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল।

স্বামীজি মিসেস ওলিবুলের অতিথি হলেন।

স্বামীজির বক্তৃতাগুলি এ সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল। প্রচুর বিক্রয় হতে লাগল।

আমেরিকাবাসীদের হৃদয় তিনি এমনভাবে জয় করেছিলেন যে তাঁরা স্বামীজিকে নিজেদের একজন বলেই ভাবতেন। এমন কি এনসাইক্লোপিডিয়াতে একজন আমেরিকান তাঁকে আমেরিকান বলে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকান মহিলা কবি এলাহুইলার লিখেছেন।

...বারবছর আগে কৌতুহলবশত স্বামীর সঙ্গে বিবেকানন্দ নামে ভারতীয় দার্শনিকের ভাষণ শুনতে যাই। দশ মিনিট শুনতে না শুনতে আমাদের মন এক সূক্ষ্ম রাজ্যে চলে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত

তাঁর কথা শুনে আমাদের বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা ও বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।···বিবেকানন্দ এক নতুন কথা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন যার জন্য তিনি বলেন, তোমরা সত্য উপলব্ধি কর—তোমাদের জ্ঞানের উন্মিলন হোক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ফক্স স্বামীজিকে আমন্ত্রণ করলেন। সেখানে তিনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপকের পদ দিতে চাইলেন।

স্বামীজি রাজি হলেন না। বললেন, আমি সন্ন্যাসী. চাকরি নিয়ে আমি কি করব। বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট লেখেন, স্বামীজি ব্যাখ্যা করেছেন যে ধর্ম শুধু কতকগুলি কথা বা ভাব নয়। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই সেই ভাব দেখাতে পারলেই তা ধর্ম লাভ হয়। বেদান্ত ধর্মের সাহায্যে মানুষের অমরত্ব লাভ সম্ভব।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সভা স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যে রাজ যোগ. কর্ম যোগ ও ভক্তি যোগ প্রকাশিত হয়েছে। রাজ যোগ গ্রন্থ নিয়ে অ্যানাটমি ও সাইকোলজিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়ন জাগল।

স্বামীজি তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

পাঁচ

নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অবসর পেলেই স্বামীজি গল্প করতেন।

একদিন নৈশ ভোজনের সময়ে মিসেস ওলিবুলের গৃহে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে পরিচয় হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চলে।

জেমস সাহেব চলে গেলে মিসেস ওলিবুল প্রশ্ন করেন—জেমসকে কেমন লাগল ?

স্বামীজি বললেন,—খাসা লোক, চমৎকার !

একজন মহিলা 'হেফিবারে' ভুগছিলেন।

স্বামীজি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার জ্বর সারিয়ে দেব ?

মহিলাটি উৎসুক হয়ে উঠলেন, বললেন,—তাহলে খুব ভাল হয়।

স্বামীজি মহিলার হাত দুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষন পরে চুপ করে উঠে চলে গেলেন।

তারপর থেকে মহিলার আর জ্বর হয়নি।

ওলিবুলের অনুরোধে কেম্ব্রিজের মেয়েদের কাছে 'হিন্দু রমণীর আদর্শ' নামে একটি বক্তৃতা করেন।

স্বামীজি বলেন,—ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে আমেরিকানরা সত্য ধারণা পোষণ করেন না। ভারতীয় নারীর চরিত্র ও মাতৃত্ব উদাহরণ দিয়ে তিনি উপস্থিত মহিলাদের ভুল ভেঙ্গে দেন।

স্বামী সারদানন্দ ইংল্যাণ্ডে স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অনেকদিন পরে গুরু ভাইকে দেখে স্বামীজি আনন্দিত হলেন। মঠের সংবাদ পেলেন।

স্বামীজি ক্লাশ খুলে জ্ঞান যোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন। এছাড়াও সভাসমিতি বা কারো বাড়ি থেকে অনুরোধ এলে

সেখানেও বক্তৃতা দিতেন।

একদিন এ্যানি বেশান্তের সঙ্গে স্বামীজি আলাপ হলো।

একদিন এক সভার পরে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্বামীজিকে বললেন, আপনি খুব ভাল বলেছেন, কিন্তু তেমন নতুন কিছু বলেন নি। তবুও আপনাকে আপনার বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বামীজি বললেন,—আমি যা বলেছি তা শুধু সত্য মাত্র। এ সত্য হিমালয়ের মত এমন কি ঈশ্বরের মত প্রাচীন।

স্বামীজির সহায়তায় মিঃ স্টার্ডি এসময়ে নরেন ভক্তি সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ করেন।

ম্যাক্সমূলারের সঙ্গেও স্বামীজির এসময়ে আলাপ হয়। ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছিলেন। স্বামীজিকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।

ম্যাক্সমূলার স্বামীজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। স্বামীজিকে তিনি নিজে যেয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

বলতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যকে তো আর রোজ দেখতে পাওয়া যাবে না।

ম্যাক্সমূলার স্বামীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন,—জগতে রামকৃষ্ণকে প্রচার করার জন্য আপনারা কি করেছেন ?

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ জীবনী জানতে চান, বলেন তিনি রামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে চান।

স্বামীজি, স্বামী সারদানন্দের উপরে উপকরণ সংগ্রহের ভার দিলেন

ম্যাক্সমূলার সাহেব সে উপকরণ নিয়ে পুস্তক রচনা করেন।

ইংরাজেরা স্বভাবতই রক্ষণশীল। সহসা নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না। কাগজগুলিও সেরকম হঠাৎ নতুন কিছু ছাপতে চায় না। কিন্তু স্বামীজির বিষয়ে সব কাগজেই কিছু না কিছু

প্রকাশিত হত।

ডেলী ক্রনিকেল লেখে—

স্বামীজি একজন বেদান্তবাদী। তার ব্যবহার, চেহারা, দার্শনিক আলোচনা শুনলে বুঝতে পারা যায় আমেরিকায় তার এত খ্যাতি কেন? তাঁকে আঙ্গুল তুলে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে দেখা যায় না, সমস্ত ধর্ম থেকেই তিনি যেন সার সংগ্রহ করেছেন!

অনেকে মনে করেছেন স্বামীজি হয়ত কোন নতুন দল গঠন করবেন।

স্বামীজি বলতেন—না আমি কোন দল গঠন করতে আসিনি। আমি সন্ন্যাসী, প্রচার করাই আমার কাজ।

অনেকেই স্বামীজিকে গুরুত্বে বরণ করে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্বামীজি ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে প্যারিসে এলেন। প্যারিসে এক রাত থেকে জেনেভায় গেলেন।

জেনেভায় স্বামীজি তিনদিন ছিলেন।

কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক স্বামীজিকে কিছুদিনের জন্য তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন।

স্বামীজি সুইজারল্যাণ্ড হয়ে জার্মানী যাবার জন্য রওনা হলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্নে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন হাইডেনবার্গ। তারপর গেলেন বার্লিন।

বার্লিন স্বামীজির কাছে খুব ভাল লাগে।

অধ্যাপক ডয়সন স্বামীজির-উপস্থিতি জানতে পেরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। স্বামীজি অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

নানা আলাপ আলোচনার পরে ডয়সন সাহেব স্বামীজির যুক্তিগুলি স্বীকার করে নিলেন।

স্বামীজি অধ্যাপকের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন।

ডয়সন সাহেব ভেবেছিলেন স্বামীজি বেশ কিছুদিন থাকবেন। সে সুযোগে দর্শন নিয়ে আলাপ করা যাবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে

যাবার তাড়া থাকায় স্বামীজি বিদায় নিলেন।

হামবুর্গ সভায় স্বামীজি তিনদিন থাকলেন।

অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে যেখানে আবার দেখা হয়। এক সঙ্গে হল্যাণ্ড গেলেন। হল্যাণ্ড থেকে স্বামীজি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

হ্যামষ্টেডে কদিন বিশ্রাম করে আবার কাজে নামলেন।

এবার সঙ্গে আছেন স্বামী অভেদানন্দ। তিনি ভারত থেকে সবে মাত্র আসছেন।

স্বামাজি ঠিক করলেন অভেদানন্দকে রেখে দেশে ফিরবেন।

ব্লুমবেরী স্কোয়ারে অভেদানন্দকে বক্তৃতা করবার সুযোগ দিলেন। অভেদানন্দের প্রথম ভাষণ শুনে বিবেকানন্দ খুশি হলেন। বুঝলেন যে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরতে পারা যায়।

ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করবার আগে লণ্ডনের পিকাডেলিতে এক সভা হয়। সে সভায় এত লোক হলো যে শেষ পর্যন্ত লোকের আর দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত রইল না।

সকলেই তাকিয়ে আছেন মঞ্চের দিকে। স্বামীজি ইংল্যাণ্ড-বাসীদের প্রতি বিদায়বাণী উচ্চারণ করে বললেন—আবার দেখা হবে।

স্বামীজি ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে লণ্ডন ত্যাগ করলেন। ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় স্বামীজির সাফল্য নিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল কাগজে— প্রবন্ধ লেখেন।

স্বামীজি দেশে ফিরে চলেছেন—সঙ্গে ভক্ত ও শিষ্যরা।

একজন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলে,—এদেশ এখন আপনার কাছে কেমন লাগবে?

তিনি উত্তর দিলেন—এখানে আসবার সময়েই ভারতকে ভাল-বাসতাম। এখনও বাসি। এখনও ভারতে প্রতি অনুপরমাণু, ভারতের বাতাস আরো পবিত্র। ভারত আমার তীর্থ—ভারত

আমার মাতৃভূমি।

স্বদেশে ফিরবার কালে স্বামীজি একটু ঘুরে দেশে ফিরলেন। প্রথমে এলেন মিলান। সেখান থেকে রোম। রোম সম্বন্ধে স্বামীজির উচ্চ ধারণা ছিল। ঘুরে ঘুরে অতীত স্মৃতিগুলি দেখলেন।

নেপলস্ থেকে জাহাজ ছেড়েছে। স্বামীজি স্বদেশের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ভূমধ্যসাগর দিয়ে যখন জাহাজ চলেছে, স্বামীজি স্বপ্ন দেখলেন। একজন ঋষি এসে তাঁকে বলছেন, তুমি এখন ক্রীট দ্বীপের কাছ দিয়ে চলেছ। এখানে প্রথম খৃষ্ট ধর্মের উৎপত্তি হয়। আমি খোরাপুটি সম্প্রদায়ের একজন...

পরের কথাগুলি স্বামীজি স্মরণ করতে পারেন নি —বলেছেন। বোধহয় সেই ঋষি এসেনী এমনি একটা কিছু বলছিলেন।

যীশুখৃষ্ট এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

ঘুম ভাঙ্গতেই স্বামীজি ডেকে ছুটে এলেন। একজন কর্মচারীর কাছে সময় জানতে চাইলেন।

কর্মচারী বলল --বারোটা।

---আমরা কোথায় এসেছি ?

—ক্রীট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।

স্বামীজি স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে অবাক হলেন।

এডেন থেকে কলম্বোর পথে দুটি মিশনারীর সঙ্গে তর্ক হলো। মিশনারীরা স্বামীজিকে খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের প্রভেদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, স্বামীজি উল্টে কতকগুলি প্রশ্ন করেন।

মিশনারীরা উত্তর দিতে পারল না। গালাগাল করতে লাগল।

স্বামীজি সহ্য করতে পারলেন না।

একজন মিশনারীর গলায় হাত দিয়ে বললেন,— ফের যদি আমার ধর্মকে কিছু বল, তবে আমি জাহাজ থেকে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

স্বামীজি রুদ্রমূর্তি দেখে মিশনারীর বীরপুরুষেরা কাঁপতে কাঁপতে

বলল, মশাই ছেড়ে দিন, আর কখনও একাজ করব না।

স্বামীজির এই দিগ্বিজয়ে প্রাচ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে।

কলম্বো জাহাজঘাটে নামতেই বিরাট জনতা অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলো। স্বামীজি এসব কিছু জানতেন না। সকলেই তাঁকে দেখতে চায়।

ষ্টীম লঞ্চে স্বামীজি সন্ধ্যার আগে তীরে নামলেন।

স্বামীজিকে অভ্যর্থনা মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল।

দর্শনার্থী জনসাধারণ মনের আবেগে ছাতা, লাঠি, রুমাল নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

কনসার্টে বাজছিল ভারতীয় সুর। স্বামীজি অভ্যর্থনা মঞ্চে গেলেন। অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজি বললেন—এ সম্বর্দ্ধনা, এ সম্মান আমাকে নয়, এ হচ্ছে একটা নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। হিন্দু জাতিকে বাঁচাতে হলে ধর্মই একমাত্র অবলম্বন।

কলম্বোর ফ্লোরাল হলে স্বামীজি প্রথম বক্তৃতা দেন। এর পরে পাব্লিক হলে বক্তৃতা দেন।

কলম্বো থেকে ক্যাণ্ডি যান।

ক্যাণ্ডি সিংহলের স্বাস্থ্যনিবাস!

ক্যাণ্ডি দর্শন করে অনুরাধাপুরে এলেন। অনুরাধাপুর থেকে গেলেন জাফনা। জাফনা থেকে ভারতের দিকে রওনা হলেন। একটি জাহাজ ভাড়া করে জলপথে পাম্বান দ্বীপে এলেন। ঠিক হলো রামেশ্বরে রামনাদ মহারাজের কাছে যাবেন। কিন্তু মহারাজ নিজেই অভ্যর্থনা করবার জন্য পাম্বানে এসেছিলেন।

স্বামীজি এখান থেকে রামেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলেন।

রামেশ্বর দর্শনের পরে ভারতের মাটিতে স্বামীজি প্রথমে রামনাদের মহারাজের অতিথি হলেন। স্বামীজিকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান হলো। উত্তরে স্বামীজি বললেন,—মহানিদ্রার পরে সুপ্তোত্থিতের মত শবদেহ নতুন প্রাণ পেয়েছে। কুম্ভকর্ণের

ঘোর ভেঙ্গে নিদ্রার অবসান হচ্ছে—রামনাদের পর মাদ্রাজ অভিমুখে চললেন স্বামীজি। মনজন্থুরা, মজনন্থুরা, কুম্ভকোনাম হয়ে মাদ্রাজে পৌঁছলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনেই বিপুল জনতা স্বামীজির দর্শনের আশায় অপেক্ষা করেছে।

মায়াভরম ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপরেই তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

মাদ্রাজবাসীদের প্রতি স্বামীজি মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ জানালেন।

সমস্ত মাদ্রাজ যেন মেতে উঠল। জয়ধ্বনি, পুষ্পতোরণ, পুষ্প-বৃষ্টি উৎসবে মাদ্রাজ চঞ্চল, মাদ্রাজে আর কখনও এমন সমারোহ হয় নি। মানুষের উদ্দীপনা দেখে স্বামীজি বললেন, এ আগুন যেন নিভে না যায়।

স্বামীজির নিকট বিদেশী ভক্ত ও গুণমুগ্ধরা আসতেন। কত বিভিন্ন স্তুতি, কত প্রশংসা—কিন্তু সর্ব্বত্যাগী এই বীর সন্ন্যাসী তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

মাদ্রাজ থেকে স্বামীজি কলকাতার পথে রওনা হলেন। কলকাতা আজ দিন গুণছে, কবে তার প্রিয় স্বামীজি আসবেন।

স্বামীজি যেদিন কলকাতায় এসে নামলেন, সেদিন কলকাতার পথে ঘাটে শুধু লোক।

স্বামীজি পশুপতিবাবুর বাগবাজারের বাড়িতে এসে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হলেন। বিকেলে আলমবাজার মঠে এলেন।

সাতদিন কেটে গেল স্বামীজি বিশ্রামের সময় পান না। অভিনন্দনের পরে অভিন্দন, জনস্রোতের পরে জনস্রোত।

স্বামীজি দেশের যুবকদের বললেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ওঠ—জাগো—সুসময় উপস্থিত। আমি আমার দেশের উপরে বিশ্বাস রাখি—বিশেষ করে দেশের যুবকদের উপরে। এগিয়ে এসো প্রাপ্য বর লাভে বরেণ্য হও।

ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব এসে পড়ল। এ বছর আর উৎসাহের

শেষ নাই পঞ্চবটীতে ঠাকুরের ভক্তগণ এসেছেন। গিরিশ ঘোষও সে সঙ্গে আছেন। তাঁকে নমস্কার করে স্বামীজি বললেন ঘোষজা সেই একদিন আর এই একদিন।

প্রতি নমস্কার করে গিরিশ ঘোষ বললেন, তা বটে, কিন্তু ইচ্ছে হয় আরো দেখি। উৎসব শেষে সকলে মঠে ফিরলেন।

বিদেশী ভক্তদের বললেন—সাধারণের জন্য বাইরের উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন—এই সব আড়ম্বরের মধ্য দিয়েই সাধারণ লোক ধর্মভাব গ্রহণ করে। এ সময়ে স্বামীজি গোপাললাল শীলের কাশীপুরের বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন। সকলের সঙ্গে মিশতেন, ধর্মের কথা গীতার কথা বলতেন।

স্বামীজির বিশেষ লক্ষ্য ছিল যুবসম্প্রদায়ের উপরে। তিনি অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, আবার ধমক দিতেও কসুর করতেন না। একদিন একজন গুরু ভাই বলেন, তুমি যে কেবল সেবার কথা বল, দান আর পরোপকার সম্পর্কে বল, ওসবের মধ্যে মায়া আছে। যদি মুক্তিই চরম লক্ষ্য হয়—তবে এ-সব মায়া কাটানোও দরকার।

স্বামীজি হেসে বললেন—মুক্তির এই ইচ্ছেও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? বেদান্ত বলেছে আত্মা চির মুক্ত—তবে আবার মুক্তির চেষ্টা কেন? প্রশ্নকারী চুপ করলেন।

স্বামীজি কর্মযোগ প্রচারের পক্ষপাতী।

বৈরাগ্য, সংসার-বিমুখতা, ধ্যানধারণা যতটা সহজ, কর্মের উৎসাহ ততটা সহজ নয়। সত্বগুণের নামে সমস্ত দেশ আলস্য ও জড়তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে, স্বামীজি একথা বুঝেছিলেন। আমি কিছুনা—আমি হীন—এধারণা মানুষকে ক্রমে হীন করে দেয়। সুতরাং এই আত্মগ্লানি আত্মহত্যার মত।

তাই বুঝি স্বামীজি বলতেন—আমরা জ্যোতির সন্তান—বিশ্ব-জগতের জ্যোতির মধ্যে ভেসে আছি।

একদিন একজন স্বামীজিকে অবতার মুক্ত পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কি প্রশ্ন করেন। স্বামীজি বললেন—বিদেহ মুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। পৃথিবীতে যে সব যুগপুরুষেরা অবতীর্ণ হন তারা মুক্তিকে তাদের শক্তির মধ্যেই দেখতে পান। তাই তারা অপরের সাহায্যে মুক্তি খুঁজে বেড়ান না।

দেশের অধঃপতনে স্বামীজি দুঃখ পেতেন।

তিনি বলতেন,—শক্তি চাই শক্তিমান হও। উপনিষদ শক্তির খনি। যে জাতি এ বিষয়ে উদ্যোগী নয় সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। নিজের উপর বিশ্বাস রাখলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে।

স্বামীজি শিষ্যদের বলতেন, সকলে সত্য গ্রহণ কর।

একদিন দুজন লোক স্বামীজির কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে জানতে যায়।

স্বামীজি তাদের কোন রকম প্রশ্ন না করতে দিয়ে প্রাণায়াম সম্বন্ধেই দীর্ঘ আলোচনা করেন। লোক দুটি নিজেদের কথা স্বামীজিকে এরকম ভাবে বলতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

তাদের অবাক হতে দেখে স্বামীজি হেসে বললেন আমি সব জানতে পারি, পূর্ব্বজন্মের কথাও বলতে পারি।

কলকাতায় স্বামীজির হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে—স্বামীজি দার্জিলিং গেলেন। সঙ্গে অনেকেই ছিলেন।

মিঃ এম, এন ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক সে বাড়িতে থাকতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে ভুল বকছিলেন। স্বামীজি ঘরে ঢুকে তার মাথায় হাত দেবার পরে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন।

স্বামীজি আবার দু'মাস বাদে কলকাতায় ফিরলেন।

এসেই কয়েকজনকে সন্ন্যাস ধর্মে দিক্ষা দিলেন।

সন্ন্যাস নিতে ইচ্ছুকদের বলতেন—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা

—তোমরা মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণ কর—তোমাদের জননী ধন্য। আত্মনে মোক্ষায়াং জগদ্ধিতায় চ—এই সন্ন্যাসের আসল উদ্দেশ্য। বহু জনহিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম।

১৮৯৭ সালের ১লা মে বলরাম বাবুর বাড়িতে ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য একটি সংঘ স্থাপনের আলোচনা করা।

॥ ছয় ॥

১৮৯৭ স্যালের ১লা মে।

বলরাম বাবুর বাড়িতে ভক্ত সন্ন্যাসী ও গুরু ভাইরা এসেছেন। স্বামীজি একটি সংঘ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

গিরিশ ঘোষ সংঘের নাম দিলেন, রামকৃষ্ণ প্রচার সমিতি পরে নাম হয় রামকৃষ্ণ মিশন।

মিশনের উদ্দেশ্য হলো—রামকৃষ্ণ দেবের ধর্মমত ও উপদেশ প্রচার ও কর্মক্ষেত্রে তার ব্যবহার। রাজনীতির সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক থাকবে না। শুধুই সাধারণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তা ও কাজে আত্মনিয়োগ।

সংঘের মূল সভাপতি হলেন স্বামীজি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ হলেন কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতি। ঠিক হলো প্রতি রবিবার বলরাম বাবুর বাড়িতে সভা বসবে। শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতা হবে।

প্রথম তিনটি বছর সংঘের সভা বলরাম বাবুর বাড়িতেই হয়েছে। প্রথম দিকে সংঘের সভায় তেমন সাড়া পাওয়া যেত না। কিন্তু স্বামীজির চেষ্টায় সকলেই এদিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

রামকৃষ্ণের এরকম প্রচারে কোন কাজ হবে বলে যোগানন্দ স্বামী সংশয় প্রকাশ করতেন। আর একজন শিষ্যকেও সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখে স্বামীজি বললেন,—তোরা ধর্মের এখনও কিছুই জানিস না। সারাদিন গান করে কীর্ত্তন করলেই রামকৃষ্ণ এসে তোদের হাতে ধরে স্বর্গে নিয়ে যাবে। ভগবান ছেলের হাতের খেলনা? খুঁজলেই পাবি? আমি রামকৃষ্ণের বা অন্য কারো দাস নই, নিজের মুক্তি না চেয়ে যে পরের সেবা করে আমি তাঁর দাস।

তেজ, উৎসাহ, উদ্দীপনায় স্বামীজি জ্বলন্ত সূর্য্যের মত, অন্যকেও আলোকিত করে তুলতেন।

কিছুদিন পরে স্বামীজি আলমোড়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যান। এখানে স্বামীজি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন।

স্বামীজির স্বাস্থের কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত প্রত্যাগত ডাক্তার ব্যারোজ হঠাৎ আমেরিকায় স্বামীজির নামের কুৎসা রটনা করে। স্বামীজি প্রতিবাদ করেন নি। তবুও এ বিষয়ে চিঠি লিখতে হতো। সাহেবের বিরোধিতা সত্বেও ইওরোপ আমেরিকায় স্বামীজির প্রভাব খর্ব্ব হয় নি। বরং স্বামীজির প্রভাব আরো বিস্তার লাভ করেছিল।

আলমোড়ায় বিশ্রাম শেষ করে স্বামীজি আবার কর্মক্ষেত্রে নামবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আলমোড়া থেকে যাবার আগে স্বামীজি এখানে প্রথম হিন্দিতে বক্তৃতা করেন।

একদিন ম্যাক্সমূলারের কথায় স্বামীজি গভীর আবেগে বলে ওঠেন, বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে দেখলে আবার বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর কথা মনে হয়।

আলমোড়া থেকে স্বামীজি বেরিলীতে যান, বেরিলীতে তিনি একজনকে বলেন – আর পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী তিনি বাঁচবেন না।

বেরিলি থেকে আম্বালায় আসেন। আম্বালায় এক সপ্তাহ ছিলেন।

আম্বালা থেকে লাহোর, লাহোর থেকে অমৃতসর। গুরু নানকের দেশ। অমৃতসর থেকে স্বামীজি রাওলপিণ্ডি যান।

রাওলপিণ্ডিতে আবার অসুস্থ হলেন। স্বামীজি মারি পাহাড়ে চলে গেলেন। মারিতে কিছুদিন কাটিয়ে কাশ্মীরে চলে যান।

শ্রীনগরে স্বামীজি অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা পেলেন। সকল শ্রেণীর লোকই স্বামীজিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে স্বামীজি মুগ্ধ হলেন। নৌকা করে ডাল হ্রদে ঘুরে বেড়াতেন। কিছুদিন কাশ্মীরে থেকে

স্বামীজি আবার মারিতে ফিরে এলেন। মারি থেকে রাওলপিণ্ডি থেকে কাশ্মীর মহারাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে জম্মুতে আসেন। জম্মু থেকে শিয়ালকোট হয়ে আবার লাহোরে ফিরে আসেন। লাহোরে স্বামীজি গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন পণ্ডিত হংসরাজ সহ্য করতে না পেরে স্বামীজির সঙ্গে তর্ক করতে আরম্ভ করেন। স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না।

এখানে একজনকে স্বামীজি খুব প্রশংসা করেন। সে কথা শুনতে পেয়ে একজন ভক্ত বলেন—স্বামীজি, লোকটি কিন্তু আপনাকে পছন্দ করে না।

স্বামীজি বললেন,—তাতে কি হয়েছে? ভাল লোক হলেই আমাকে মানবে, এ রকম কোন কথা নাই। আমার সঙ্গে মতের মিল না হলেও ভাল লোক ভালোই থাকে।

স্বামীজির কথা শুনে ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন।

অধ্যাপক তীর্থরামের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় হলো। অধ্যাপক স্বামীজির প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামতীর্থ স্বামী নামে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। পরে ইনি আমেরিকা গিয়ে স্বামীজিকে অনুসরণ করে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন।

স্বামীজি লাহোর থেকে দেরাদূন যান।

ভেবেছিলেন দেরাদূনে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন। কিন্তু কাজের চাপে তা আর হলো না। খেতরির রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে খেতরি চলে আসেন।

প্রব্রজ্যাকালের পুরানো ভক্তদের সঙ্গে আবার দেখা হতে লাগল। স্বামীজি এই পুণর্মিলনে খুব খুশি হলেন।

খেতরির রাজা স্বামীজিকে বার মাইল এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করেন। রাজা সাহেব কিছুদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরেছেন।

বহু জায়গা থেকে এ সময় স্বামীজির কাছে নিমন্ত্রণ এলেও সব জায়গায় যেয়ে উঠতে পারেন নি।

কলকাতায় ফিরে এলেন।

আলমবাজার থেকে মঠ তখন বেলুড়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে তখন রামকৃষ্ণ মঠের আস্তানা।

বেলুড়ে মঠের জমি কেনা হলো।

শিবরাত্রি উপলক্ষে মঠে এসে সকলে মিলিত হলেন। বিরাট সমারোহ আরম্ভ হলো। এ সময়েই স্বামীজি নিবেদিতাকে দীক্ষা দিলেন।

স্বামীজির মানস কন্যা নিবেদিতার পূর্বনাম মার্গারেট নোবল। এই ইউরোপীয় মহিলা ভারতবর্ষকে এত ভাল বেসেছিলেন যে অনেক সময় মনে হয় কোন ভারতীয় বোধ করি ভারতবর্ষকে এত ভালবাসতে পারেনি।

স্বামীজি স্বাস্থ্য ভাল চলছিলনা। চিকিৎসকের পরামর্শে দার্জিলিং গেলেন। কিন্তু এক মাস পরেই কলকাতায় ফিরে আসতে হলো!

প্লেগ মহামারীরূপে কলকাতায় দেখা দিয়েছে। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নিয়ে সেবার কাজে লাগলেন।

সহরের প্রতিটি গলি প্রতিটি কোণে স্বামীজির কল্যাণ হস্ত প্রসারিত হলো। পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নিবেদিতার উপরে। স্বামীজি মঠের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কোদাল নিয়ে নিজ হাতে ময়লা পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন।

মহামারী আয়ত্বে এলো।

স্বামীজি আবার শৈলাবাসে চলে গেলেন। কাঠগোলা, নৈনিতাল হয়ে স্বামীজি আলমোড়ায় সেভিয়ার দম্পতির কাছে কিছুদিন কাটালেন। আলমোড়ায় অবস্থান কালে নিবেদিতা ছাড়া মিসেস ওলিবুল জোসেফাইন, ম্যাকলাউড এ সময়ে স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন। এই সব বিদেশী শিষ্যদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের শিক্ষা, এদেশের ইতিহাস, সমাজ, উপকথা তিনি আলাপ আলোচনা

করতেন। যাতে এই বিদেশী শিষ্য শিষ্যারা ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের কাছে বিবেকানন্দ যেন আবার নতুন ভাবে দেখা দিলেন। ধর্ম আলোচনা ও স্বদেশের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর বিদেশী অনুরাগী শিষ্য শিষ্যাদের অন্তর স্পর্শ করে। স্বাধীন জাতি, স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের মর্ম্ম তারা বোঝেন ও শ্রদ্ধা করেন।

আমেরিকা ও ইউরোপের বেদান্ত প্রচারক এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক, জাতির ও মাতৃভূমির উন্নতি বিধানে স্থির সংকল্প করলেন।

এ সময় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অনেক বার বলেছেন।

এখন অন্তত পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশমাতা তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবী হোক। অন্য দেব দেবীর উপাসনার প্রয়োজন নাই।

স্বামীজি বলতেন 'বি এণ্ড মেক'। তৈরী কর।

শুধু স্বদেশবাসীদের নয় তিনি বিদেশী শিষ্য শিষ্যাকে কাজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান। শিক্ষা ও সেবার আলোক জ্বালাবার ভার দিলেন এই সব বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের।

কাজের ভিতর দিয়ে এদেশের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বাড়বে। তাঁরা নিজের দেশের মতই ভারতবর্ষকে ভাল বাসবেন। দেশটিকে না ভালবাসতে পারলে সে দেশের ধর্মের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় হয় না।

একদিন এক বিদেশী শিষ্য স্বামীজিকে প্রশ্ন করলেন,—স্বামীজি আপনাকে কি করে আরো বেশী সাহায্য করতে পারি?

স্বামীজি উত্তর দিলেন, ভারতকে ভালবাস।

এ সময় স্বামীজি শিষ্য ও শিষ্যাদের নিয়ে উত্তর ভারত পর্যটন করছিলেন। প্রথমে স্বামীজি নৈনিতালে উপস্থিত হলেন। খেতরির মহারাজও তখন সেখানে ছিলেন।

একজন মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজির পরিচয় পেয়ে ভক্ত হয়ে পড়লেন। স্বামীজি সন্ন্যাসী, বীর সন্ন্যাসী বললেই ঠিক বলা হয়।

রোমা রোঁলা স্বামীজিকে অনেকবার যোদ্ধা সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিকই তিনি যোদ্ধা ছিলেন।

বাংলাদেশের কায়স্থ সম্প্রদায় কলমের মত তরবারি চালনায়ও সিদ্ধহস্ত। এ জন্যই রোমা রোঁলা তাঁকে যোদ্ধা সন্ন্যাসী বলতেন।

স্বামীজির ধ্যান, জ্ঞান সবই ভারতবর্ষ। ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য যেন তিনি তাঁর জীবনটি উৎসর্গ করেছিলেন।

আলমোড়ায় এ্যানি বেশান্তের সঙ্গে স্বামীজির ত্ব'বার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ই উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন।

স্বামীজি খুব ভোরে উঠে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন তারপর মিসেস ওলিবুলের বাসস্থানে এসে কিছুক্ষণ নানা আলাপ-আলোচনা করতেন। গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেন।

কিছুদিন এ ভাবে কাটাবার পরে স্বামীজি নির্জন বাসের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। আলমোড়া থেকে নির্জনবাসে চলে যান।

নির্জনবাস থেকে ফিরে গডউইন ও পওহারী বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। রামকৃষ্ণের পরেই পওহারী বাবাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তবুও গডউইনের মৃত্যু সংবাদে তিনি বেশী আঘাত পান। মনের ভার লাঘব করবার জন্য স্বামীজি গডউইনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লেখেন।

আলমোড়া আর স্বামীজির ভাল লাগছিল না। তিনি আরো নির্জনে থাকবার ইচ্ছায় কাশ্মীরে চলে যান।

একজন ভদ্রলোক অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন। বহু চিকিৎসা করিয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। স্বামীজির কথা শুনে তাঁকে একবার দর্শন দেবার জন্য প্রার্থনা জানান। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল স্বামীজি যোগী পুরুষ, আশীর্ব্বাদ করলে তিনি রোগ মুক্ত হবেন। স্বামীজি এখানে এসেই তাকে রোগ মুক্ত করেন।

স্বামীজি ভদ্রলোকের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।

কাশ্মীর থেকে স্বামীজি অমরনাথ যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা।

যাত্রীরা হাঁটা পথে চলেছেন। স্বামীজিও সেই দলের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজিকে অভ্যর্থনা জানালেন। ডাল হ্রদের তীরে দুদিন তন্ময়ভাবে কাটিয়ে স্বামীজি আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন।

শিবের ঘোর শক্তির আহ্বানে কেটে গেলে তিনি অনুভব করলেন যেন মা তাঁর হাত ধরে টানছেন।

একদিন সন্ধ্যায় তাঁর মনে হলো সমস্ত জগৎ সংসার যেন কোন অসীমের পানে উড়ে চলছে। স্বামীজির সমস্ত চেতনা মায়ের ধ্যানে মগ্ন। এই ভাবাবেশে 'কালী দি মাদার' কবিতাটি লিখেই স্বামীজি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বলে উঠলেন—

তিনিই কাল—তিনিই পরিবর্তন—তিনি অমিত শক্তির আধার। প্রাণে তাঁর আশ্রয়, গতি তাঁর মৃত্যুর দিকে—মা কাছেই আছেন।

একদিন হঠাৎ তিনি কোথায় চলে গেলেন। কিছুদিন পরে আবার শ্রীনগরে ফিরে এলেন। এসময়ে প্রায়ই তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তেন ও একা থাকতে চাইতেন।

কাশ্মীর থেকে স্বামীজি কলকাতায় ফিরলেন।

স্বামীজির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। বেলুর মঠে চলে এলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই স্বামীজি আবার কাজে মেতে উঠলেন।

নিবেদিতা বাগবাজারে হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করতে লাগলেন। বাগবাজার বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুললেন।

ডিসেম্বর মাসে মঠ স্থাপনের উৎসব হলো।

স্বামীজি ঠাকুরের পাদুকা পূজা করলেন। বললেন—এই মঠ হবে উদারভাবের কেন্দ্রস্থল। সঙ্কীর্ণতা এখানে প্রবেশ করবে না।

সমস্ত মতবাদের সমন্বয় হবে এখানে এই মঠে।

স্বামীজির শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। হাঁপানীর টান দেখা দিয়েছে। ডাক্তার সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু স্বামীজি সম্পূর্ণ উদাসীন।

বলতেন—অমরনাথ সেই যে মাথায় উঠে বসে আছেন, আর নামবেন না।

আমার মন এখন শিবময়।

স্বামীজি চিকিৎসার জন্য বেশির ভাগ সময়ই কলকাতায় কাটাতেন। ডাক্তার বিশ্রাম করতে বলেন। কিন্তু সারাদিন স্বামীজির বিশ্রাম নাই। লোক সমাগম হয় স্বামীজিও সাক্ষাৎ করেন। স্নান আহারে সময় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না।

শিষ্যরা বাধা দেয়।

স্বামীজি বলেন—এরা আমাকে চায়, তুটো কথা শুনতে আসে, তোরা বলছিস আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব না?

স্বামীজি অনিদ্রায় ভুগছেন। একবার গ্রহণের সময় ঘুমোতে চেষ্টা করলেন।

বললেন—গেরণে কাজ করলে শতগুণ লাভ হয়, ঘুমিয়ে দেখি যদি শতগুণ ঘুম পাওয়া যায়।

উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হলো। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ হলেন সম্পাদক। কাগজ দেখে স্বামীজি খুব খুশি হলেন।

একটা প্রেস কিনে ফেলা হলো। ঠিক হলো কাগজ পাক্ষিক পত্রিকা হবে। পনের দিন পরে পরে কাগজ বার হবে।

স্বামীজি বৈদ্যনাথ চলে এলেন। আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সামান্য পড়াশুনা করতেন, আর নিয়ম মত থাকতে চেষ্টা করতেন। প্রতিদিন ভোরে উঠে বেড়াতে যেতেন।

একদিন বেড়িয়ে ফিরবার মুখে একজন অসুস্থ লোকের কষ্ট দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের যন্ত্রণার ক্লেশ ভুলে গিয়ে

লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেবাযত্নে নিরাময় করে তুললেন।

সন্ন্যাস জীবনে স্বামীজি সেবাকে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন নর-নারায়ণের সেবা কর নারায়ণের সেবা হবে। ধর্ম-কর্মের জন্য মন্দির-মসজিদে যাবার দরকার নাই।

মঠের ব্যাপারে গৃহস্থদের কোন কর্তৃত্ব স্বামীজির সহ্য হতো না। বিদেশীদের অনুকরণও ছিল তাঁর কাছে অসহ্য।

তিনি বলতেন, স্বজাতি স্বদেশ স্বধর্ম যে ভুলে যায় সে ধিক। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন—

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাস-সুলভ দুর্বলতা এই সম্বলে তুমি উচ্চাধিকারলাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?

আরো বলতেন, হে ভারত, ভুলিওনা তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।

জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে স্বামীজির তীব্র বিরাগ ছিল।

তিনি বলেছেন, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

স্বদেশ সম্পর্কে স্বামীজির উক্তি—ভারত আমার যৌবনের উপবন। বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—

স্বামীজির প্রতি বক্তৃতা, প্রতি বাণী দেশ সেবার উদাত্ত আহ্বান ঘোষণা করত।

স্বামীজির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বাস্থ্য যত ভেঙ্গে পড়ে কাজও ততই বাড়ে। সেবা কাজ ও স্বাস্থ্য অবনতির প্রতিযোগিতা চলছে।

ডাক্তারেরা তাঁকে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করলেন। স্বামীজি সে

কথা বিশেষ শুনলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত সকলেই যুক্তি করে তাঁকে পাশ্চাত্য ভ্রমণে সম্মত করালেন। দেশ থেকে দূরে গেলে কিছুটা বিশ্রাম পাবেন।

যাত্রার ব্যবস্থা হলো। সঙ্গে নিবেদিতা যাবেন। স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যরা নিবেদিতাকে সঙ্গে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ যেমন গুরু তেমন শিষ্যা। সকলেই জানে, নিবেদিতার কাছে তাঁর গুরুর স্থান উঁচুতে। তিনি স্নেহ ও যত্নে গুরুকে মায়ের মত সেবা করবেন।

স্বামীজিকে বিদায় অভিনন্দন জানান হলো।

উত্তরে স্বামীজি বললেন,--সন্ন্যাসীর মৃত্যু ভয় নাই। বেঁচে থাকবার বাসনা বা মোহ থেকে সে মুক্ত। পরের জন্য জীবন তুচ্ছ করাই তার ধর্ম। তার ব্রত।

'সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিবোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

মৃত্যু ছাড়া যখন অন্য কোনো সত্য নাই, তখন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাতই শ্রেয়।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন স্বামীজি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য যাত্রা করেন।

শ্রীমা সকলকে খাওয়ালেন।

নরেন শ্রীমার যতখানি শ্রীমাও নরেনের ততখানি।

শ্রীমাকে স্বামীজি জীবন্ত দুর্গা বলতেন। কোন কারণে মন চঞ্চল হলে বা কোন সমস্যায় আকুল হলেই স্বামীজি শ্রীমার শরণ নিতেন।

স্বামীজি বলতেন, রামকৃষ্ণকে জানি না, তিনি রামকৃষ্ণই হোন বা দেবতাই হোন, কিন্তু আমি হচ্ছি মা'র বীরভদ্র একবার হুকুম পেলেই হয়।

বিদায় দিতে সকলে প্রিন্সেপ ঘাটে এলেন। গোলকুণ্ডা জাহাজ প্রস্তুত হয়ে আছে। সঙ্কেত পেলেই জল কেটে এগিয়ে যাবে।

স্বামীজির সঙ্গে আছেন নিবেদিতা আর স্বামী তুরিয়ানন্দ।

সকলের মুখই বিষাদক্লিষ্ট।

জাহাজ ধীরে ধীরে জেটি ছেড়ে এগিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সকলে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকে স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে।

ধীরে ধীরে জাহাজ দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

কথা ছিল জাহাজে স্বামীজি নিয়মিত ব্যায়াম করবেন। না করলে স্বামী তুরিয়ানন্দ মনে করিয়ে দেবেন।

প্রথম দু'একদিন স্বামীজি ব্যায়াম করলেন। তারপরই ভুলে গেলেন। তুরিয়ানন্দ মহারাজ সে কথা মনে করিয়ে দিতে স্বামীজি বলে উঠলেন – হরি ভাই আজ থাক। দেখছ সব ছেড়ে নিবেদিতা আমার কাছে এসেছে দুটো কথা শুনবার জন্য। বড় বুঝদার মেয়ে, ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।

গোলকুণ্ডা মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো পৌঁছলো। কলম্বো থেকে এডেন, নেপলস, মার্সেল হয়ে লণ্ডনে পৌঁছলো। সেদিন ছিল ৩১শে জুলাই।

কলকাতা থেকে লণ্ডন পৌঁছতে তখন সময় লাগত প্রায় দেড় মাস।

নিবেদিতা জাহাজে স্বামীজির কাছে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন।

নিবেদিতা বলেছেন, এই সময়টুকু আমার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান।

স্বামীজির ইংলণ্ডে আগমনের সংবাদ বহু শিষ্য, ভক্ত ও বন্ধুরা দর্শন করতে এলেন। এবার স্বামীজি লণ্ডনে কোন প্রকাশ্য বক্তৃতা করলেন না, ঘরোয়া আলোচনা সভা করেছেন।

ইওরোপ আগমনের সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছলো। আমেরিকা থেকে অনুরোধের পরে অনুরোধ আসতে লাগল। স্বামীজি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্রায় দেড়মাস লণ্ডনে কাটিয়ে স্বামীজি তুরীয়ানন্দ ও আরো কয়েকজন আমেরিকান শিষ্যদের নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন।

॥ সাত ॥

স্বামীজি নিউইয়র্ক এলেন।

মিষ্টার ও মিসেস লেগেট স্বামীজিকে বিশ্রামের জন্য তাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

হাডসন নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে মিষ্টার লেগেটের গ্রাম্য ভবন। মনোরম পরিবেশ। নিউইয়র্ক থেকে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে।

একমাস পরে নিবেদিতাও লণ্ডন থেকে এখানে স্বামীজির কাছে এলেন।

এখানে স্বামীজির স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হলো।

নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দ তখন প্রচারে ব্যস্ত! সংবাদ পেয়ে তিনিও এলেন। স্বামীজি নিউইয়র্কে এসে প্রকাশ্যে একটি বক্তৃতা দিলেন। বেদান্ত সমিতি স্বামীজিকে অভ্যর্থনা জানাল।

স্বামীজি দু'সপ্তাহ নিউইয়র্কে ছিলেন। তারপর তিনি ক্যালি-ফোর্ণিয়ায় চলে যান। যাবার পথে শিকাগো নামলেন।

লসএঞ্জেলসে এসে মিসেস ব্লজেটের অতিথি হলেন।

চারদিকে স্বামীজির বাণী শোনবার জন্য সাড়া জাগল। পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা তিনি দিলেন। এ সময়ে তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি বোধহয় আগের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় বহু আমেরিকান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। একটি নতুন ভক্তমণ্ডলীর সৃষ্টি হলো।

কাগজে কাগজে বক্তৃতার সারাংশ ও ছবি ছাপা হলো। হিন্দুমতে মুক্তি পথের কথা জেনে রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন বললেন, এই অসাধারণ প্রতিভার কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ ছেলেমানুষ। এঁর জ্ঞানের সীমা জানা সম্ভব নয়।

স্বামীজি কিছুদিন স্যানফ্রানসিসকোতে কাটালেন।

এখানে তিনি প্রতি রবিবার ধর্ম, দর্শন, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ কখন বা ভক্তিযোগ অথবা জ্ঞানযোগের উপরে বক্তৃতা করতেন।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে এখানে বলেন শ্বাস জয় হলেই চিত্ত জয় করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

একদিন নদীর ধারে তিনি বেড়াচ্ছেন। কয়েকজন যুবক ও যুবতী নদীর বুকে ভাসমান ডিমের খোলা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। কিন্তু কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

স্বামীজি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন।

যুবকেরা রেগে গিয়ে বললেন—আপনি কাজটিকে যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়, এদিকে এসে বন্দুক হাতে নিয়ে পরখ করে দেখুন না।

স্বামীজি এগিয়ে গিয়ে বন্দুক নিলেন। পর পর বারোবার লক্ষ্যভেদ করলেন।

যুবক যুবতীরা অবাক। ভাবল বোধহয় অনেক দিনের অভ্যাস।

স্বামীজি বললেন, তিনি আর কখনও বন্দুক ছোঁড়েননি। আসল ব্যাপার মনোযোগ।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় বেদান্তের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। মঠ ও সমিতি স্থাপিত হলো, স্বামীজি বিশ্রামের জন্য আবার গ্রাম্যভবনে ফিরে গেলেন।

ক্যাম্পটেল গ্রামে তিন সপ্তাহ বিশ্রাম করে আবার স্যানফ্রানসিসকোতে ফিরে এলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসকেরা বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

স্বামীজির স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে লেগেট দম্পতি চিন্তিত হয়ে স্বামীজিকে প্যারিতে এসে বিশ্রাম করতে বললেন।

প্যারিতে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। একটি ধর্মসভা হবে এ রকম স্থির হলো।

স্বামীজি ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

পথে ডেট্রয়েট ও শিকাগোয়ে নামলেন। সেখান থেকে নিউইয়র্কে এলেন।

বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কার্য্যালয়ের পর পর কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করলেন।

যাবার সময় গুরুভাইদের শুভকামনা জানিয়ে গেলেন—যাও ভাই, মা তোমাদের সহায় হবেন।

স্বামীজি লেগেট দম্পতীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু এখানেও বিশ্রাম পেতেন না। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী নানা লোকের সমাগমে সর্বদাই ভীড় লেগে থাকত।

স্বামীজির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। স্বামীজি ফরাসী ভাষা জানতেন না। ধর্মসভায় বক্তৃতা দেবার দু'মাস আগে স্বামীজি ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করতে আরম্ভ করেন। এই দু'মাসেই তিনি এমন সুন্দর করে ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করে ফেললেন যে, অনায়াসে তিনি ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্বগুলি অনর্গল ফরাসীতে বক্তৃতা করতে সক্ষম হয়ে উঠলেন।

প্রথমদিন কংগ্রেসে স্বামীজি উপস্থিত হলেন।

গষ্টাভ নামে একজন জার্মান প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হিন্দুধর্মের উপরে একটি প্রবন্ধ পড়েন।

তিনি বলেন—শিবলিঙ্গ পুরুষ জননেন্দ্রিয়ে চিহ্ন, শালগ্রাম শিলা যোনি স্বরূপ। যোনি ও লিঙ্গের আরাধনা থেকেই কালক্রমে এই প্রতীক পূজার সুরু হয়।

স্বামীজি প্রতিবাদে বক্তৃতা করেন।

তিনি বেদ থেকে প্রমাণ তুলে যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন এ ধারণা ভুল। প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্র ভোজন উৎসবে নরমাংস খাওয়ার কথার যেরকম ভুল, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনি পূজার সম্বন্ধও সে রকম ভুল।

দ্বিতীয় দিন বক্তৃতায় স্বামীজি বলেন বেদই হিন্দুধর্ম। ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্মের মূল।

স্বামীজির বক্তৃতা সকলকে অভিভূত করে ফেলে, সকলেই তাঁর যুক্তি ও বক্তব্যের সত্যতা নিঃসন্দেহে মেনে নেয়। সভাপতিও তাঁর ভাষণে স্বামীজি প্রশংসা করেন।

প্যারিস সম্বন্ধে স্বামীজি বলেছেন, এই নগর ইওরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ যেন মর্ত্তের অমরাবতী,- সবাই এদের নকল করে। ফরাসীদের সম্বন্ধে স্বামীজির ধারণা ভাল ছিল।

সভা শেষ হয়ে গেলে স্বামীজি মিসেস ওলিবুলের অনুরোধে বৃটানিতে চলে যান। নিবেদিতাও বৃটানিতে এলেন। প্রিয় গুরুকে কাছে পেয়ে নিবেদিতা খুশি হয়ে উঠলেন। বস্তুতঃ নিবেদিতার যেমন গুরু ভক্তির তুলনা নাই, স্বামীজিও সেরকম তাঁর মানস কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন।

বৃটানিতে স্বামীজি বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনীর উপরে বিশদ আলোচনা করেন। বুদ্ধদেবের উপরে স্বামীজির অসীম ভক্তি ছিল।

স্বামীজি বৃটানি ত্যাগ করবার আগেই নিবেদিতা ইংলণ্ডে ফিরে যান।

বিদায় কালে নিবেদিতা স্বামীজির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলে তিনি :শিষ্যকে বললেন,—যদি আমি তোমাকে তৈরী করে থাকি তবে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও, আর যদি জগদম্বা তোমাকে তৈরী করে থাকেন তবে এগিয়ে যাও।

বৃটানি থেকে স্বামীজি প্যারিস ফিরে এলে তাঁর কাছে ভারত ও হিন্দুধর্মের কথা শুনবার আগ্রহে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সমাগম হতো।

প্যারির বিদগ্ধ সমাজে বাঙ্গালীর বেদনা স্বামীজি অনুভব করেন।

তিনি লিখেছেন···চারদিক থেকে নিজের দেশের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মানুষ এসেছে। অথচ এই মহামিলন কেন্দ্রে বাংলা, তুমি কই? কে তোমার নাম নেয়? সমবেত সেই প্রতিভা মণ্ডলীর মধ্য থেকে

বীর বঙ্গভূমির একটি সন্তান তবু মাতৃনাম উচ্চারণ করলেন, তিনি জগদীশ বসু। আপন প্রতিভা দিয়ে ধন্য করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজকে, ধন্য বীর তিনি।

তিন মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে স্বামীজি বিদায় নিলেন।

প্রথমে এলেন ভিয়েনায়। ভিয়েনায় তিন দিন ছিলেন। ভিয়েনার পরে হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া হয়ে কনষ্টান্টিনোপলে এলেন, এখান থেকে ষ্টিমারে এথেন্স গেলেন। এথেন্স থেকে মিসর। মিসর থেকে ভারতে ফিরলেন।

ষ্টিমার বোম্বে পেঁছলে তিনি ছোট ছেলেদের মত আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। তাঁর আগমন সংবাদ কেউ জানত না।

৯ই ডিসেম্বর রাত্রে স্বামীজি বেলুড়মঠে এলেন। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা খাচ্ছিলেন। বাগানের মালী ছুটে এসে বলল, একজন সাহেব এসেছেন।

সকলেই ভাবছেন, কিজন্য কোথা থেকে এ অসময়ে সাহেব এলেন! তারপর সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে চিনতে পেরে সকলেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

স্বামীজি এসেছেন—স্বামীজি এসেছেন—!

মঠে আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল। সমস্ত রাত কেউ ঘুমোলেন না।

প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন ভুল নয় তো? গেটে চাবি বন্ধ, মালী এসেছে চাবি নিতে, স্বামীজি এলেন কি করে!

স্বামীজি বললেন, শুনলাম তোরা খাচ্ছিস, আমি চাবির জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে তোরা যদি সব সাবড়ে দিস। তাই দেয়াল টপকে এসেছি।

পাতা বিছিয়ে খিচুরি প্রসাদ নিলেন। অনেকদিন খাননি। স্বামীজি পরম পরিতৃপ্তিতে খেলেন। তারপর চলল সারারাত গল্প।

স্বামীজি বললেন. প্রথমবার যখন ও-দেশে গেছি তখন ও-দেশের লোকের দল বেঁধে কাজ করবার ক্ষমতা দেখে অবাক

হয়েছি। কিন্তু এবার গিয়ে দেখলাম আসলে ওদের ব্যবসা প্রবৃত্তিটাই মুখ্য। অর্থলোভ, স্বার্থপরতা, আত্মক্ষমতা লোভের চেষ্টা সবচেয়ে প্রধান। যত বেশি দেখলুম, তত বুঝলুম দেশটা নরক্।

স্বামীজি আবার কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন।

জীর্ণ স্বাস্থ্য, ভগ্ন দেহ তবু অবিশ্রাম কাজে ডুবে থাকেন।

মিঃ সেভিয়ার মারা গেছেন, স্বামীজি মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মায়াবতী যাবেন স্থির করলেন।

কাঠগোদাম থেকে মায়াবতী ৬৫ মাইল। হেঁটে যেতে হয়। স্বামীজি কাঠগোদামে এসে কুলি পেলেন না। প্রচণ্ড শীত, তার উপরে পাহাড়ের রাস্তাও এসময় খুব খারাপ থাকে।

প্রথনদিন সন্ধ্যায় স্বামীজি চারি পেঁৗছলেন। ডাক বাংলোয় উঠলেন। পরের দিন আরম্ভ হলো বৃষ্টি।

অনেক বেলায় বার হলেন। পনের মাইল যেতে হবে। এর মাঝে আর দাঁড়াবার জায়গা নাই।—পথে যেমন বৃষ্টি তেমন বরফ পড়তে আরম্ভ হলো।

স্বামীজির ভ্রুক্ষেপ নাই। যেন ভারি মজা পাচ্ছেন। ডাণ্ডি-বাহকদের পা পিছলে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা। দিন শেষ হয়ে এলো। বরফ আর বৃষ্টির বিরাম নাই। একটা ছোট্ট দোকান ঘরে স্বামীজি রাত কাটালেন।

পরদিন ভোরে আবার বরফ ভেঙ্গে যাত্রা সুরু হলো।

মায়বতী পেঁৗছলেন।

মায়বতীতে এবার স্বামীজি তেমন বেড়াতে পারেন নি। প্রচণ্ড তুষারপাতে বেশীর ভাগ সময়ই ঘরে বসে থাকতেন।

আশ্রমবাসীরা স্বামীজির আগমনে খুশি হলেন।

একদিন বললেন,—যার মধ্যে দেখবি প্রেম ও ভালবাসা খাঁটি, দেখবি তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

কয়েকদিন পরে স্বামীজি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তুষারপাতের জন্য কুলি পাওয়া যায় না। ঠিক হলো ভিন্ন রাস্তায় ফিরে যাবেন।

পিভিলিও থেকে ট্রেনে রওনা হবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একজন ইংরাজ কর্ণেল বসে আছে, স্বামীজি ও সদানন্দ মহারাজকে উঠতে দিল না।

স্বামীজি ষ্টেশন মাষ্টারকে জানালেন।

ষ্টেশন মাষ্টার স্বামীজিকে অন্য কামরায় যাবার কথা বললেন।

স্বামীজি তিরস্কার করে উঠলেন,—তোমার এ কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে না।

ষ্টেশন মাষ্টার সরে পড়লেন।

স্বামীজি এসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলেন।

কর্ণেল সাহেব তখন কামরায় ছিল না। ফিরে এসে ষ্টেশনমাষ্টার ষ্টেশনমাষ্টার বলে কিছুক্ষণ চীৎকার করে নিজেই অন্য কামরায় সরে পড়ল।

স্বামীজি বেলুড়ে ফিরে এলেন।

প্রায় দেড় মাস মঠে কাটল। কিন্তু শরীর মোটেই ভাল হলো না।

স্বামীজি ঢাকায় গেলেন।

ঢাকায় স্বামীজি জনসভায় দুটি ভাষণ দেন।

এখানে একদিন একজন পতিতা স্বামীজির দর্শনপ্রার্থী হয়ে দেখা করতে চায়। শুনে স্বামীজি ভিতরে ডেকে পাঠালেন।

পতিতা মেয়েটি এসে বললে,—আমি হাঁপানিতে ভুগছি আমাকে ওষুধ দিন। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।

স্বামীজি উত্তর দিলেন,—আমিও হাঁপানিতে ভুগছি মা, ওষুধ জানলে কি আর ভুগি?

ঢাকা থেকে স্বামীজি কামাখ্যা যান।

স্বামীজির স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হলো। তাই স্বামীজি শিলং গেলেন। কিন্তু শিলং গিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

একদিন তিনি বললেন,—মৃত্যুতে কি আসে যায়? হাজার বছরের ব্যবস্থা করে গেলাম।

স্বামীজি শিলং থেকে বেলুড়ে ফিরে এলেন।

প্রায়ই পূর্ব্ববঙ্গের গল্প করতেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন,—ঢাকায় প্রায়ই একটা বাচ্চাছেলে এসে একটা ফটো দেখিয়ে বলত—বলুন তো ইনি অবতার কিনা?

জানিনা বললেও রোজই আসত, রোজই এক প্রশ্ন করত। শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে একদিন বললাম, বাবা একটু ভাল খাবার খেয়ো, মাথার ঘিলু শুকিয়ে যাচ্ছে। এর পরে ছেলেটি আর রাগ করে আসেনি।

স্বামীজির রোগের প্রকোপ খুবই বেড়ে গেল।

গুরু ভাইরা এবার জোর করে তাকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন।

স্বামীজি প্রায় সাত মাস চুপচাপ করে কাটালেন। কিন্তু তাঁর মত কর্মচঞ্চল লোকের পক্ষে এ ব্যবস্থা অসহ্য।

বাইরে কিছু না করলেও স্বামীজির মন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকত।

ভারতবর্ষের নানা দেশের বিভিন্ন লোক স্বামীজির কাছে যাওয়া আসা করত। স্বামীজি তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে তাঁর দেহ জীর্ণ হলেও মন সতেজ ছিল। তাই একটু সুস্থবোধ করলেই কাজ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

স্বামীজি এসময় সকালে ঘুম থেকে উঠতেন, তারপর ধ্যান করে গরুর সেবা করতেন ও ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতেন। মঠে কতগুলি হাঁস, সারস, কুকুর, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি ছিল। তিনি নিজে এসব পশুপাখির খাবার তদারক করতেন। এদের সঙ্গে কথা বলতেন ও এদের নিয়ে খেলা করতেন।

বহু দূর দেশ থেকে তাঁকে দর্শন করতে এসে অনেক সময় লোকেরা স্বামীজিকে এরকম ছেলে মানুষের মত পশুপাখি নিয়ে

খেলা করতে দেখে আবাক হয়ে যেত।

স্বামীজি এসময় সমাজের ধার ধারতেন না। নিজের ইচ্ছামত কাজ করতেন।

পূর্ব্ববঙ্গ থেকে ফিরবার পরে স্বামীজির পা ফুলে উঠল। শোথ রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু এর জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি। সব সময়েই মুখের হাসিটি অম্লান। বলতেন, মা যা করেন, ওসব ভেবে কি করব। বেশ আছি। তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলতেন যে তাঁর দেহের রোগের গ্লানি আছে বলে মনে হতো না।

একদিন শরৎ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছেন ?

স্বামীজি বললেন, দেহ দিন দিন অচল হয়ে আসছে।

শরৎ চক্রবর্তী বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন, তাহলে সেরে উঠবেন।

স্বামীজি বললেন, সে আর হবে না। ঠাকুরের কালী ঠাকুর মারা যাবার দু'দিন আগে এ শরীরে ঢুকে বসে আছে। স্থির থাকতে দেয় না তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এমনি করে দিন চলে।

গুরুভাইদের চিন্তার অন্ত নাই, ভক্তরা উদ্বিগ্ন —কিন্তু স্বামীজির কোন রকম চাঞ্চল্য নাই। হাস্যপরিহাস করেন, কেউ দেখা করতে এলে দেখা করেন, যেন কিছুই হয়নি।

সবই তিনি মায়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন।

সকলেই স্বামীজির জন্য উদ্বিগ্ন, চিকিৎসার কথা ভাবছে। এবার আরম্ভ হলো কবিরাজি চিকিৎসা।

স্বামীজি কিছুটা সুস্থ হলেন। সবাই মনে করল কবিরাজি চিকিৎসায় স্বামীজি সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাঁকে কোন কাজ করতে দেওয়া হতো না। একমাত্র পড়াশুনা বিষয়ে কারও কোন আপত্তি ছিল না।

স্বামজির এ সময়ে আর কোন কাজ না থাকায় পড়াশুনার

ডুবে গেলেন।

মঠে এ সময় এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কেনা হলো। একদিন একজন শিষ্য বললেন, এক জীবনে এসব পড়ে শেষ করা যাবে না।

এরমধ্যেই স্বামীজির প্রায় দশ খণ্ড পড়া হয়ে গেছে।

শুনে স্বামীজি বললেন, কি বলছিস ? পড়া যায় না! আচ্ছা তুই প্রথম দশ খণ্ড থেকে আমাকে প্রশ্ন কর।

শিষ্য অবাক হয়ে বলল, আপনি এর মধ্যেই দশ খণ্ড পড়ে ফেলেছেন ?

না পড়লে আর বলব কেন ?

এভাবে পড়া এক স্বামীজির পক্ষেই সম্ভব। অন্য কোন লোকের সাধ্যাতীত। এই অদ্ভুত পঠন শক্তি ও স্মরণ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকবার এরকম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

স্বামীজির ইচ্ছায় এবার মঠে দুর্গা পূজার আয়োজন হলো। শুধু ঘট পূজো নয় প্রতিমা বানিয়ে পূজা।

স্বামীজির ইচ্ছা শুনে একজন গুরুভাই বললেন,— তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, মা দুর্গা গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে মঠে এসেছেন।

শ্রীমার কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠান হলো।

শ্রীমা অনুমতি দিলেন।

মঠে পূজার ধূমধাম লেগে গেল।

পূজার সময় শ্রীমা মঠে এলেন। মঠে আনন্দের মেলা বসে গেল। শ্রীমার উপস্থিতিতে স্বামীজি ও গুরুভাইরা খুব খুশি হলেন।

দুর্গাপূজার পরে লক্ষ্মী ও কালী পূজা হলো।

এর মধ্যে স্বামীজি গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে কালীঘাটে গেলেন। কালীঘাটে মানত ছিল।

ভুবনেশ্বরী দেবী মানত শোধ করে এলেন।

এসময়ে দেব দেবীর পূজার প্রতি স্বামীজির আন্তরিক আকাঙ্খা

দেখা দিল। যদিও বেদান্তে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তবুও তিনি বলতেন, শাস্ত্রের মর্যাদা নষ্ট করতে আমি আসিনি। আমি এসেছি মর্যাদা পূর্ণ করতে। অক্টোবর মাসে স্বামীজির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল।

চলাফেরা করাও তাঁর অসাধ্য হয়ে উঠল।

একজন বিদেশী বড় ডাক্তার স্বামীজিকে দেখে গেলেন। বলে গেলেন, শারীরিক বা মানসিক যে কোন রকম পরিশ্রমই এখন স্বামীজির পক্ষে ক্ষতিকর। একেবারে পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

গুরুভাইরা সতর্ক ভাবে স্বামীজিকে পাহারা দিতে লাগলেন। ডাক্তারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।

স্বামীজি সামান্য সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে। সে তেজ, সে শক্তি এখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও কত কাজ বাকী।

তু'জন জাপানী ভদ্রলোক, বৌদ্ধ মন্দিরেরঅধ্যক্ষ মিঃ ওডা আর সঙ্গী ওকাকুরা বেলুড়ে এলেন। স্বামীজিকে জাপান ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন।

জাপানে ধর্মজাগরণের দরকার। আর সে জাগরণ একমাত্র স্বামীজির দ্বারাই সম্ভব। তাই তাঁরা স্বামীজিকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন।

স্বামীজি রাজি হলেন।

মিঃ ওডা আর ওকাকুরা স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করে মোহিত হয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে স্বামীজির জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক হলেন। যতই আলাপ হয় ততই তারা স্বামীজির প্রতি আকৃষ্ট হন।

স্বামীজি এই জাপানী অতিথিদের সঙ্গে বুদ্ধগয়া গেলেন। কয়েক দিন বুদ্ধগয়ায় থেকে, সেখান থেকে কাশী গেলেন।

কাকুরা কাশী থেকে বিদায় নিলেন। স্বামীজি কাশীতে থেকে

গেলেন। কাশীতে বাঙ্গালী ছেলেদের দিয়ে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়লেন। এই সেবা প্রতিষ্ঠান পরে রামকৃষ্ণমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হয়।

কাশীতে কিছুদিন কাটিয়ে স্বামীজি বেলুড়ে ফিরে এলেন।

কাশীতে তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন, কিন্তু মঠে এসেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

সকলেই চিন্তিত। স্বামীজিকে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

একদিন স্বামীজি নিরঞ্জন মহারাজকে বললেন,--তোরা এত ভাবছিস কেন ; শরীরটা জন্মেছে আবার চলে যাবে। এইত নিয়ম। সৃষ্টির প্রথম থেকে চলে আসছে। তোরা এটা বুঝিস না কেন ? সর্বদা মনে রাখবি---আমাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে—ত্যাগ।

শরৎ মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন আর বেশীদিন নয়। সময় হয়ে এসেছে। একদিন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমাকে উদ্ধার করে দিয়ে যান।

স্বামীজি সস্নেহে বললেন,—কে কাকে উদ্ধার করতে পারে বল ? গুরু শুধু অন্ধকার দূর করে দিতে পারে।

নিবেদিতার সঙ্গে একদিন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা স্বামীজিকে দর্শন করতে এলেন।

সকলেই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। উৎকণ্ঠা নাই শুধু স্বামীজির।

এক একদিন শারীরিক গ্লানি তুচ্ছ করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতেন। সকলের সঙ্গে গান করতেন, হাসি তামাসা করতেন।

স্বামীজির এ পরিবর্তন দেখে কেউ কেউ ভাবল তিনি বোধহয় ভাল হয়ে আসছেন।

গুরুভাই ও ভক্তদের বিষন্ন মুখ স্বামীজির সহ্য হতো না। তাঁদের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য স্বামীজি এরকম করতেন।

লোকে দেখা করতে এলে গুরুভাইরা দেখা করতে দিত না।

স্বামীজি তা দেখে বলতেন, তোরা একি করছিস? আমার দেহটাকে তোরা এতবড় করে দেখছিস কেন? দেশের লোকের মুক্তির জন্য আমি বারবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে রাজি।—

শিষ্যদের উপরে স্বামীজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোন শিষ্য ঠিকমত ধ্যান না করলে কঠিন শাস্তি দিতেন। নিজে তিনি তিনটায় শয্যা ত্যাগ করতেন।

যদি কোনদিন অসুস্থতার জন্য ধ্যানে বসতে না পারতেন— অন্যদের খবর নিতেন।

স্বামীজির আদর্শ সামনে রেখেই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ক্রমশঃ অধিকতর ত্যাগ ও কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন।

স্বামীজি মিশনের সবরকম কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। প্রায় সব সময়ই ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সমস্ত বিষয়েই উদাসীন হয়ে উঠলেন।

শিষ্যরা বুঝতে পারল সময় এগিয়ে এসেছে। এবার স্বামীজি মহাপ্রয়াণ করবেন।

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, নরেন যেদিন নিজেকে জানতে পারবে তখনি সে দেহ ত্যাগ করবে।

একদিন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজি আপনি কে? সে কথা জানতে পেরেছেন কি?

স্বামীজি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, পেরেছি বইকি?

এ উত্তর শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

দেহ ত্যাগের কয়েকদিন আগে স্বামীজি পঞ্জিকা দেখতে চাইলেন। ব্যগ্রভাবে পাতা উলটে যেন কি খুঁজছেন। একজন শিষ্যকে পাঁজি পড়ে শোনাতে বললেন। শিষ্য পাঁজি পড়ে শোনাতে লাগল।

স্বামীজি হঠাৎ বললেন, থাক আর লাগবে না।

দেহত্যাগের দুই-তিন দিন আগে স্বামীজি গঙ্গার ধারে একটি

স্থান আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার সৎকার এই জায়গায় করবি।

শেষের ক'দিন স্বামীজি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ছিলেন। দেহ মনে এক অলৌকিক বিভা।

স্বামীজির প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতাকে নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। নিজে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দিলেন, তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন।

নিবেদিতা আপত্তি জানাতে বললেন,—ঈশাও তার শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা চমকে উঠলেন। বলতে চাইলেন,—সে তো শেষের দিন।

শেষের দিন সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। তারপর ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত ক্লাসে ডেকে পাঠালেন। বিকালে কিছুটা বেড়িয়ে এলেন। বললেন, শরীরটা আজ বেশ হাল্কা লাগছে।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে আরতির ঘণ্টা শুনে নিজের ঘরে গেলেন। ধ্যানের পরে মালা জপ করতে লাগলেন।

কাছেই একজন ব্রহ্মচারী বসেছিলেন। স্বামীজি তাঁকে সমস্ত জানালা খুলে দিতে বললেন।

তারপর স্বামীজি শুয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মচারী গুরুর পদসেবা করছে। রাত তখন নয়টা। স্বামীজির মুখ থেকে শিশুর মত কান্না শোনা গেল। তারপরে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। দেহ স্থির ও নিশ্চল। সারা মুখে জ্যোতির আভা।

ব্রহ্মচারী স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ডেকে আনলেন। স্বামীজির নাড়ী পাওয়া গেল না। সংবাদ পেয়ে সকলে ছুটে এলেন। সকলের মনেই আশঙ্কা। সকলে ঠাকুরের নাম কীর্তন করতে লাগলেন। কিন্তু স্বামীজির সমাধি আর ভাঙ্গল না। এবার সাধক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিদের চোখেও জলের ধারা নামল। কেউ

কেউ গেলেন ডাক্তার আনতে।

ডাক্তার এসে বললেন, স্বামীজি আর নাই।

মন মানতে চায় না। লোকের স্রোত ছুটে আসতে লাগল বেলুড় লক্ষ্য করে।

স্বামীজি শুয়ে আছেন। একটু বিকৃতি নাই। শুয়ে আছেন যেন অকম্পিত অম্লান তেজশিখার মত।

মহাযোগী মহানিদ্রায় ধ্যানমগ্ন।

সে দিনটি ছিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার। স্বামীজি প্রায়ই বলতেন আমি কখনও চল্লিশ পার হব না।

স্বামীজি চল্লিশ পার হননি তার আগেই মহাপ্রয়াণ করলেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেলেন অমরবাণী, অমর কথা। যা হয়ে আছে আমাদের জীবনপথে ধ্রুবতারা।

———

পরিশিষ্ট

ঘটনা	সময়
জন্ম	১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি
রামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ	১৮৮১ খৃঃ নভেম্বর
ঠাকুরের মহাসমাধি	১৮৮৬ „ ১৬ই আগষ্ট
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ	১৮৮৭ „
শিকাগোর ধর্মমহাসভায় গমন	১৮৯৩ „ ৩১শে মে
ধর্মমহাসভায় প্রথম বক্তৃতা	১৮৯৩ „ ১১ই সেপ্টেম্বর
প্রথম ইংলণ্ডে গমন	১৮৯৪ „
স্বামীজির কাছে নিবেদিতার দীক্ষা গ্রহণ	১৮৯৪ „
রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা	১৮৯৭ „ ১লা মে
দ্বিতীয়বার লণ্ডন যাত্রা	১৮৯৯ „
বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তন	১৯০০ „ ৯ই ডিসেম্বর
মহাসমাধি	১৯০১ „ ৪ঠা জুলাই

জগতের কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সৃষ্টি।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব সময়ে ভারত তখন সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছে। দেশের নাই স্বাধীনতা, দেশবাসীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। ধর্ম কতগুলি বিচারহীন আচারের সমষ্টি।—

কেউ কেউ বা ধর্মকে উপহাসের বস্তু মনে করে। বিজেতা পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরনে তখন গৌরব।

ধর্ম, জাতি ও দেশকে এই মিথ্যা কুহক থেকে বাঁচাবার জন্য রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও বিবেকানন্দের সৃষ্টি।

আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম ও মানব প্রেমের যে দীপশিখা তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, সে শিখা ক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে শিখার একটি অতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ এনেছে আমাদের স্বাধীনতা।

মেরুদণ্ডহীন জাতি যখন পাশ্চাত্যের পদলেহনে মত্ত, তখন একটি সিংহকণ্ঠ উচ্চারিত হলো।

'— বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

—হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।'

'—হে বীর সাহস অবলম্বন কর—সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধ্যকের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত,—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, দুর্ব্বলতা সেই পাপ।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জননী মাতৃভূমিই যেন তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হন।—তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে। ইঁহারাই তোমার ঈশ্বর, তোমার স্বদেশ বাসীগণই তোমার প্রথম উপাস্য।—পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসীগণের পূজা করিতে হইবে।'

—'তোমাদের প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। শরীর শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহাবীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে'—

বিবেকানন্দের বাণী সমষ্টির মর্ম

BE AND MAKE

তৈরী হও ও তৈরী কর।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব যখন হয়, তখন ভারত অন্ধকার যুগে নেমে এসেছে। সর্বক্ষেত্রেই ভারতের শোচনীয় পরাভব।

বিদেশী শাসন, আত্মসঙ্কোচ, ধর্মগ্লানি অবিশ্বাসের নাগপাশে ভারত আবদ্ধ। আমরা ভারতীয়েরা বিদেশীর চেয়ে সর্বক্ষেত্রেই হীন ও পশ্চাৎপদ। আমাদের কোন জ্ঞান, বিজ্ঞান নাই। যা কিছু আছে সে সবও বিদেশীদের তুলনায় নিকৃষ্ট। এরকম একটা অন্ধ বিশ্বাস ধীরে ধীরে ভারতের আত্মাকে পঙ্গু করে তুলেছে।

মুগ্ধ নবভারত তখন পাশ্চাত্যের ভাব, আহার, পরিচ্ছদ, আচার অনুকরণ করে চলাই গৌরব মনে করে। পাশ্চাত্যের আসুরিক শক্তির দম্ভকে নবভারত বীর্য্যবত্তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মনে করে। পাশ্চাত্য জাতির সবকিছুই ভাল ও সর্ব বিষয়ে তারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই হচ্ছে তখনকার নবভারতের চিন্তাধারা।

ভারতীয় রীতিনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এ সবের মূল্য ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শনের কাছে কিছুই নয়।

জাতীয় জীবনের এই দুঃসময়ে স্বামী বিবেকানন্দ সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন।

হে ভারত, এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষ, এই দাস সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বল করিয়া তুমি বীর-ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?

স্বামীজির স্বদেশ প্রেম, জড়তা দূর করে ভারতে নব জীবনের সঞ্চার করেছে।

এই স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী শুধু ভারতের মঙ্গল সাধন করেই চুপ করে থাকেন নি। তিনি বিশ্বমানবেরও উপকার করেছেন।

বিবেকানন্দ দেশকে কখনও ভোলেন নি। তিনি বলতেন, দেশের কল্যাণের জন্য যদি নরকে যাইতে হয় তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়।'

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসাগরের মত অন্তহীন গভীর জীবন ও

বাণী ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি শুধু ভারতের ধর্ম জীবনকেই আলোড়িত করেন নি।

সমাজ সেবা, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, শিক্ষা ও সংগঠন এ সব বিষয়ে ছিলেন অদ্বিতীয় ও অগ্রগণ্য।

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহাও তাঁর সঞ্জিবনী মন্ত্রের অমূল্যদান।

জগৎ কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিপুল শক্তি; প্রিয় শিষ্যকে দিয়ে যান।

স্বামীজিও বলেছেন, যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়, স্বয়ং প্রভু।

সে শক্তি অলক্ষ্য ও ক্রিয়াশীল।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করে যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হবার কথা স্বামীজি জগৎকে বলেছেন।

কেবল বাহ্য প্রকৃতির উপরে নিবদ্ধদৃষ্টি পাশ্চাত্য জগত সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি বলে গেছেন,—শুধুমাত্র বাহ্যপ্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের এই উদগ্র বাসনা ত্যাগ না করলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় সংকট দেখা দেবে।

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দুটি মহাযুদ্ধই এ কথার প্রমাণ। শক্তিশালী আনবিক বোমার আবিষ্কার ও প্রয়োগ বাসনা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে টেনে এনেছে।

আজ মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও স্ববশে নাই। বাহ্য প্রকৃতির বিজয় লব্ধ শক্তিকে সভ্যতার মাপকাঠি হিসাবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত।

এজন্যই শান্তি বাণী শুধু মুখের কথা, মানুষ আজ দিশেহারা। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি যদি কল্যাণ সাধনে উদ্যত না হয়, তবে জগতের কল্যাণ নাই, সব চেষ্টাই বিফল হবে।

যতদিন যাচ্ছে ততই স্বামীজির বাণীর গভীরতা উপলব্ধি হচ্ছে। আধ্যাত্মিকতাই যে জীবনের মঙ্গল আজ একথা বুঝবার সময় এসেছে।

স্বামীজি বলেছেন,—ভারতীয় সভ্যতা এত আঘাত সহ্য করেও বেঁচে আছে তার কারণ সে শুধু বাহ্য প্রকৃতির দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেনি। অন্তঃপ্রকৃতির দিকেও সমান লক্ষ্য আছে। এ জন্যই ভারতীয় সভ্যতা অমর।

স্বামীজি বলে গেছেন—

'এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে। এখনই এক বিশাল বৃক্ষের পূর্বাভাস প্রতীয়মান—তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, এমন কি নবপল্লব উদ্গত হইয়াছে। যে অন্ধ, সেই কেবল দেখিতে পাইতেছে না। আর যে বিকৃত রুচি, সে তো দেখিয়াও দেখিবে না যে আমাদের দেশ মাতৃকা তাঁহার সুদীর্ঘ গভীর প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত ভারত আর নিদ্রাভিভূত হইবে না—বাহিরের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না—ওঠো, জাগো, দীর্ঘ রজনীর অবসান হইতেছে, অরুণোদয় সমাসন্ন। প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর, শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য আদেশে এবার ভারতের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী ; দেশের দুর্গত জনগণের সুখ সমৃদ্ধি সমাগত— আধ্যাত্মিকতার এক মহাবন্যা আসিতেছে। স্পষ্ট দেখিতেছি, এই উচ্ছ্বাস বন্ধন হীন সর্বগ্রাসী প্লাবন সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজি বলেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসর মাতৃভূমিই যেন আমাদের একমাত্র উপাস্য হয়। ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি।

ঠাকুর বলেছেন, এত লোক এখানে আসে নরেনের মত একজনও আসে না। আমার নরেনের ভিতরে একটুও মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।

স্বামীজিকে ছাত্রজীবনে কলেজের অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেব বলেছিলেন—

He is an excellent Philosophical student. In all the German and English Universities there is not a student so brilliant as he.

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' লিখেছেন—

Vivekananda is the undoubtedly greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send Missionaries to this learned Nation.

স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন,—

After the Congress was over, the popular Swami was invited in almost all of the large cities of the eastern and middle western states to give addresses and lectures before public clubs, societies and Universities. Before he came to New York he visited Boston, Cambridge and delivered public addresses and Lectures, expounding the philosophy and religion of Vedanta. Which were highly appreciated by the educated men and intelligent women of New England States.

মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকা লেখে,—

It is impossible to over-estimate the enthusiasm and piety that moved the vast numbers that met to-day to receive Swami Vivekananda at the Rail way station.

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরাস্তাৎ॥

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ, শোন। জ্যোতির্ময়

মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। তিনি সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপারে বিরাজমান।

ন তত্রো সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতেহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারাও নয়। বিদ্যুতও সেখানে ম্লান। আর অগ্নিই বা কোথায়, তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান। তাঁর আলোতেই সমস্ত বিভাসিত।

স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠে বহুবার এই শ্লোক সারা জগতের নর-নারীকে লক্ষ্য করে ধ্বনিত হয়েছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয়তাবোধের জাগরণ তখন অতি মৃদু।

স্বামীজির তেজ, বীর্য্য, ও উদাত্ত আহ্বান সর্বোপরি পাশ্চাত্য জগৎ বিজয় দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। সে আলোড়ন এত প্রবল যে একটি প্রাচীন সুসভ্য আত্মবিস্মৃত জাতি আত্মচেতনা ফিরে পায়।

দেশপ্রেমের সঞ্জিবনী মন্ত্রে দেশবাসী নতুন প্রাণরসে ভরে ওঠে।

যে অভিঃ মন্ত্রের পূজারীরা দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিল তাদের প্রেরণার মূল উৎস ছিল স্বামীজির বাণী ও গীতা। স্বামীজির মানস কন্যা নিবেদিতা ছিলেন এই মাতৃ-যজ্ঞের একজন বিশিষ্ট হোতা।

জাগরণের প্রতি ক্ষেত্রেই স্বামীজির বাণী আমাদের পাথেয়।

রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলী ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করে বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। কবিতাগুলি ভারতের অন্তঃপ্রকৃতির আনন্দরূপ। বিবেকানন্দ

শুধুমাত্র তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি পূর্ণ পুরুষ। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দর্শন, সাহিত্য, দেশপ্রেম ও ত্যাগে তাঁকে আরো মহীয়ান করেছে।

বাঙ্গালীর স্বাধীনতার চেতনাবোধ, নারীশিক্ষার বিকাশ, মানসিক বল এ সবের মূলে আছে এই দৃপ্ত পুরুষের দান।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানী, দার্শনিক, কঠোর তপস্বী এই মহান পুরুষকে কোলে পেয়ে বাংলা দেশ ধন্য।

'মানুষ হও এবং অপরকে মানুষ হতে সাহায্য কর।' স্বামীজির বাণী আমাদের জীবন হতে মৃত্যু পর্যন্ত অখণ্ড সাধনার জন্য।

যে মানুষ হতে চাইবে, মানব সেবায় ব্রতী হবে, স্বামীজির পবিত্র আশীর্বাদ জ্ঞান ও শক্তিরূপে তার মস্তকে বর্ষিত হবে।

স্বামীজি বলে গেছেন নিখিল আত্মার সমষ্টি স্বরূপ যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী সে ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি, এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ।

এই গানগুলি ঠাকুর রামকৃষ্ণ গাইতেন—স্বামিজীরও অত্যন্ত প্রিয় গান ছিল।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবণ।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আমার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(কুবীর)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥
কাম আদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সংগে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
কুরুচী কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিওনা কো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন ভাই আমার এই নিবেদন।
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে ॥ (কমলা কান্ত)

"ওঠগো করুণাময়ী, খোল গো কুটির দ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার ?

ডাক দেখি মন ডাকার মত
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে
কেমন শ্যামা থাকতে পারে
কেমন কালী থাকতে পারে।
মন যদি একান্ত হও
জবা বিল্বদল লও।
ভক্তিচন্দন মিশাইয়ে
(মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

ওগো আনন্দময়ী হয়ে মা, নিরানন্দ করোনা।
ওমা দু'টি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু জানে না।
তপন তনয় আমার মন্দ কয়, কি বলিব তার বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।
অহর্নিশি দুর্গা নামে ভাসি তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি, ও হর সুন্দরী, তোর দুর্গা নাম কেউ লয়না।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে (রে মন) ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি
(ওরে) বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
(যখন) দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
প্রথম ভার্য্যার, সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি :
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি॥